সোভিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাইটার্স ফোরাম  প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ১

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭২

প্রকাশক :
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
রাইটার্স ফোরাম প্রাইভেট লিমিটেড
২২ ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা ১

প্রচ্ছদ :
অজিত গুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নববিধান প্রেস
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বোস রোড
কলিকাতা ১৪

মূল্য : ৫·৫০ টাকা

স্নেহাস্পদ শুভময় ঘোষ স্মরণে উৎসর্গিত

ভুলু, তোমাকে ভুলিনি আজও। শিশুকাল থেকে দেখেছি তোমাকে। সোভিয়েত সফরকালে তোমার সঙ্গে দেখার স্মৃতিটুকু রেখে দিলাম এই ছোট বইটির মধ্যে।

[শুভময় ঘোষ। জন্ম ১০ মার্চ ১৯২৯। মৃত্যু ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩]

ভূমিকা

সোভিয়েত সফরে যাবার পূর্বে অর্ধ শতাব্দী ভারতের নানাস্থানে এবং ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করেছি— নানা যান-বাহনে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে। সে সব অভিজ্ঞতা নিয়ে রম্য-রচনা না লিখে পনেরো দিনের সোভিয়েত সফর সম্বন্ধে রোজ-নাম্চা জমিয়ে বই লিখতে গেলাম কেন— তার কৈফিয়ৎ পাঠক নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন। আমার মতো স্বল্প পরিচয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকেই বই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও মস্কোতে পনেরো দিন মাত্র ছিলেন। তিনি 'রাশিয়ার চিঠি' নামে যে অমর গ্রন্থ লিখে গেছেন তা এখনো পুরোনো হয় নি। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ লিখিত হয় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে— ১৯৩০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে য়ুরোপ-সংলগ্ন রাশিয়ার পশ্চিমাংশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৯৪৫-এর পর সোভিয়েত রাশিয়া পুনর্গঠিত হতে শুরু করে— সেই পুনর্গঠন কার্য অব্যাহত হয়ে চলছে।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন সোভিয়েত রুশের সর্বময় কর্তার আসন পান। তখন থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৫৩) সোভিয়েত দেশের চার পাশে 'লোহার পর্দা' এমনভাবে টেনে দেওয়া হয় যে, তা ভেদ করে মক্ষিকাটি পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অজানিতে দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতো না।

ক্রুশ্চেভের আমলে 'লৌহপর্দা' অপসারিত হলো। ক্রুশ্চেভ স্বয়ং দেশ-বিদেশে সফরে চললেন, বিদেশীকে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। মিত্র-অমিত্র-উদাসীন সর্বশ্রেণীর লোকে নূতন রাশিয়াকে দেখবার জন্য In-tourist হয়ে আসতে শুরু করলো। বলা বাহুল্য, কড়া নজরের মধ্যে 'স্বাধীন'ভাবে তাঁরা ঘুরে বেড়ালেন নির্দিষ্ট পথে, বিশিষ্ট শহরে-নগরে। এ ছাড়া বিদেশ থেকে শুরু

হলো ডেলিগেশনের আনাগোনা। এঁরা সোভিয়েত সরকার ও বিদেশের মিত্র-রাজ্যের যৌথ ব্যবস্থায় আসতেন। নানা দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা সোভিয়েত শিল্প ও সাহিত্য অ্যাকাদেমী থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সফরে এলেন। আমরা সেইরূপ একটি ডেলিগেশনের সদস্যরূপে সোভিয়েত সফরে গিয়েছিলাম।

কিন্তু প্রশ্ন— এই ধরনের সফরে দেশের কতটুকু চোখে পড়ে আর কতটুকু জানতে পারা যায়, যাতে করে একটা গ্রন্থ লেখা চলে? কিন্তু সেই স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই তো সবাই বই লিখেছেন। পুনরায় প্রশ্ন— লেখবার কারণ কি? আমার উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত— 'বিস্ময়'! যুদ্ধোত্তর পর্বের কল্পনাতীত উন্নতি দেখে সবাই গ্রন্থ লিখেছেন। পাঠক শুধুতে পারেন, তাহলে তুমি আর নূতন কথা কি বলবে? একই স্থান হয়তো একই গাইড দেখিয়েছেন, একই কথা বলেছেন। কথাটা খুবই সত্য। নূতন কথা কী আর আছে, কী-ই বা থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয় বা দৃশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পৃথক ভাবেই প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টিভংগী, রুচিবোধ, বাচনশৈলী, রচনা-রীতি পৃথক। আমি যা দেখেছি, যা ভেবেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি— তা আমার মতো করেই বুঝেছি এবং আমার মতো করেই প্রকাশ করেছি।

কিন্তু পনেরো দিন কি একমাস রাশিয়ার ন্যায় মহাদেশতুল্য রাষ্ট্রের কয়েকটি নগর ঘুরে কতটুকু দেখতে পারি? আর সরকারী দোভাষী মারফত দেশের মনের কথা কতটুকু জানতে পারি? আসলে কোনো দেশকে সামান্য ভাবে জানতে গেলেও সে দেশের জনতার ভাষাটা জানা দরকার এবং এতটা জানা দরকার যাতে করে কেবল সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়তে পারা নয়— জনতার কথ্য ভাষা উপভাষা বুঝতে পারা চাই। বলা বাহুল্য ডেলিগেশনের

খুব কম সদস্যই সেই সম্পদের অধিকারী। কিন্তু ভাষা না জেনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে বুঝতে পেরেছিলেন।

বহু বৎসর পূর্বে রাশিয়া সম্বন্ধে একটা বই পড়েছিলাম— তার নাম Russia, The Land of Extremes। রাশিয়ার আকাশ-বাতাস, জল-মাটির মধ্যে চরম বৈষম্য যেমন স্পষ্ট, তার নানা ভাষাভাষী অধিবাসীদের মধ্যে বৈচিত্র্য তেমন প্রকট। প্রশাসনিক ব্যাপারে রাশিয়া ছিল স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মুঠির মধ্যে। সম্রাট ছিলেন দেবতার মতো শক্তিমান— তাঁর ইচ্ছাই ছিল আদেশ এবং সে আদেশ বিনা বিচারে পালনীয়। জনতার মূঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এই রাজশক্তি। রুশীয় চার্চ ছিল রুশবাসীর নিত্যজীবনের নিয়ামক— যীশু, যীশু-জননী, অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর আইকন বা পট পূজা ছিল ধর্মের প্রধানতম অঙ্গ। খ্রীস্টানী আচারে, অনুষ্ঠানে, আড়ম্বরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার মন পাদরি-পুরোহিতের পাদপীঠে। সেই দেশে এলো বিপ্লব— অতীতকে মুছে ফেলতে হবে— নূতন স্বর্গরাজ্য গড়তে হবে—Russia, the Land of Extremes!

বহু শতাব্দী তামসিকতার মধ্যে থেকে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ঘোষণা করলো— dictatorship of the proletariat—অর্থাৎ যারা বহু শতাব্দী সকল প্রকার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, সেই মূক মূঢ় জনতার হস্তে সর্বশক্তি অর্পিত হলো।

নূতন জাগ্রত সোভিয়েত রুশ ও তার অঙ্গ সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে জ্ঞান-পিপসা দেখা দিয়েছে, তার কথা আজ সর্বদেশে সুবিদিত। পৃথিবীর বহু মানবের বিচিত্র সংস্কৃতি ও বিবিধ ভারতী সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব আজ সোভিয়েত অ্যাকাদেমিগুলিতে পুঞ্জীভূত

হয়ে উঠছে। পৃথিবীর এমন কোনো ভাষা নেই, এমন কোনো সংস্কৃতি নেই, এমন কোনো সাহিত্য নেই— যা আজ সোভিয়েত বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বাইরে আছে। প্রতিদিন এই জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃততর ও গভীরতর হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত রুশে কি সব কাজ হচ্ছে, সেই সব দেখবার জন্য আমরা চারজন নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম— সাহিত্য অ্যাকাদেমির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রধানাচার্য ড. হাজারি প্রসাদ দ্বিবেদী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন এবং আমি। আমরা সবাই শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মী। পুলিন বাবুকে কিছুতেই সহযাত্রী করা গেল না— তিনি অত্যন্ত শীত-কাতুরে মানুষ। তাই আমরা তিনজন সোভিয়েত সফর করে এলাম। ভারত থেকে তাসখন্দ পর্যন্ত যাওয়া আসার ব্যয় বহন করেন ভারত সরকার, সোভিয়েত সফরের ব্যবস্থা করেন রুশ সরকার।

প্রবাসীর তৎকালীন অন্যতম কর্মী ও হিতাকাংক্ষী, সাহিত্যিক বন্ধু সুধীরচন্দ্র চৌধুরী আমার 'সোভিয়েত সফর'-এর কথা জানতে পেরে লেখাগুলি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করলেন। আমি সেজন্য প্রবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবাসীর লেখাগুলি রাইটার্স ফোরামের পরিচালকবর্গের ভালো লাগে। তাঁরা সেগুলি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করতে চাইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শ্রীশিশির চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কথাবার্তায় বুঝলাম তিনি কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নন, সাহিত্য-দরদী মানুষও বটেন। তাঁর সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ভুবননগর
বোলপুর, বীরভূম
ডিসেম্বর ১৯৬৫

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১

পালাম এয়ারপোর্টের তিন-চার দফা হার্ড্‌ল্ টপ্‌কিয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি ইলুসিয়ানের জন্যঃ চা খাচ্ছি, গল্প করছি; সহযাত্রীরা সিগারেট টানছেন। কিন্তু এখনি ফেলে দিতে হবে…। এমন সময় মাইকে আওয়াজ দিল, তাস্‌কন্দ-যাত্রীরা প্রস্তুত হোন—ইলুসিয়ান ছাড়বে।…অনেকখানি দূরে প্লেন। ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে খোঁয়াড়ে ঢুকবার আগেই; পিছন ফিরে দেখি সে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। জানিনে তার মনে কি হচ্ছে— বুড়ো বাবা সত্তর বৎসর পেরিয়ে বিদেশে চলেছেন।

পক্ষকাল পূর্বের কথা।— কলকাতায় এসেছি— ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। বিশেষ কোন কাজ নিয়ে যে কলকাতায় আসা, তা নয়। স্বখাদ রুটিন-বাঁধা কাজ থেকে মুক্তি— খানিকটা বিশ্রামের জন্য আছি।

সেদিন সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারে যাবার কথা— দেবনারায়ণ গুপ্ত ফোনে নিমন্ত্রণ করেছেন 'শেষাগ্নি' দেখবার জন্য। কিন্তু কারা যেন এলেন— প্রুফও কিছু এল; তাই সন্ধ্যাটা ঘরেই কাটল। কাজ করছি, পাশের ঘর থেকে নাতনী বলল, 'দাদাই, তোমার নামে ট্রাংক কল আসছে, ডাকছে'। ভাবছি ট্রাংক কল কে করবে আমাকে? ছোট ছেলে থাকে দিল্লীতে— সে করছে নাকি? রিসিভার তুলে

'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে বড় ছেলের গলা শোনা গেল— শান্তিনিকেতন থেকে ফোন করছে। বলছে— "একটু আগে দিল্লীর বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে ; যা লিখেছে তা আমি পড়ে দিচ্ছি—

'In connection with Tagore Celebrations, Soviet Government invited scholars for two weeks to visit U.S.S.R. from first October. All expenses will be shared by Indian and Soviet Governments. Propose nominate you. Intimate immediately telegraphically if willing. Kichlu Dept. Search."

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করছে, 'কি উত্তর দেব।' আমি বললাম, 'আমি ত কালই বোলপুরে ফিরছি, ফিরে গিয়ে কথাবার্তা হবে'। এদিকে বার্তা শুনে ছেলে বউমা নাতি নাতনীরা খুব উৎফুল্ল ! আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিনে। ইতিপূর্বে সোভিয়েত থেকে প্রাচ্যবিদ্যার কংগ্রেসে উপস্থিত হবার জন্য দু'বার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, যাই করিনি। এককালে চীনাবৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করেছিলাম, চীনা ও তিব্বতী ভাষাও কিছুটা শিখে কাজ করি ; কিন্তু সে সব ছেড়েছি বহুকাল। দ্বিতীয়বার রেজিস্টারী চিঠি আসে। তখন জানিয়ে দিই, ওরিয়েন্টালিস্ট বলতে যা বোঝায়, আমি তা নই। তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি কখনো আলাপ-আলোচনা হয়, যেতে পারি। ব্যস্। তারপর বৎসরকাল কেটে গেছে।

১৯৬১ সালে মার্চ মাসের শেষে দিল্লীতে যে শান্তিবৈঠক বসে, তার রবীন্দ্র-শাখায় উপস্থিত হবার জন্য গিয়েছিলাম। তখন রুশীয় ও মধ্য এশিয়ার নানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ট্রাভাংকোর হাউসে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সোভিয়েত দেশের চিত্রাদির প্রদর্শনী হচ্ছে,—

ব্যবস্থা করেছেন ভারত-সোভিয়েত সভা। আয়োজনকর্তা রুশী ভদ্রলোক, নাম সেরিব্রেকোভ। এঁর সঙ্গে মস্কোতে পরে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়। সেদিনকার সভায় বাণারসী দাস চতুর্বেদী সভাপতি ছিলেন ; ইনি ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য। বাণারসী দাস বহুকাল আগে শান্তিনিকেতনে ছিলেন— সি. এফ. এণ্ড্রুজের বৃহত্তর ভারতের প্রামিক সমস্যার সহায়করূপে। আমার সঙ্গে সেই থেকেই হৃদ্যতা। সভায় গিয়ে দেখি, আমাকে অনেকেই চেনেন নামে, বোধ হয় আমার বই থেকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সোভিয়েত রুশ কি বিরাট আয়োজন করেছে দেখে তো অবাক ! একদিন সোভিয়েত দূতাবাসে সন্ধ্যাপার্টিতে যোগ দিই— বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হল।

তারপর গত নভেম্বর মাসে নয়াদিল্লীতে আবার যেতে হয়— রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সম্মেলনের জন্য ; রবীন্দ্র-পুরস্কার সেবার প্রদত্ত হয়। নোবিকোভা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হয়। নোবিকোভা ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন, আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন। বেশ বাঙলা বলেন— লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপিকা। তারপর ভারতে আসেন চেলিসফ ; ইনি মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যার প্রধান। শান্তিনিকেতনের এক সভায় তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্র-মেডাল পেয়েছিলাম। ফিরে যাবার পথে আমার সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা করে যান। এই সব কথা ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারছিনে কী করব। এ বয়সে অত দূর পাড়ি দেব ?

ইতিপূর্বে চীন থেকেও আট পৃষ্ঠাব্যাপী এক টেলিগ্রাম এসেছিল ১৯৬১ সালে ৭ই মে, কবির জন্ম-শতবার্ষিকীতে উপস্থিত হবার জন্য

নিমন্ত্রণ। কিন্তু সময় এত কম ছিল এবং পূর্বাহ্নে এত জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এবং গ্রহণ করেছিলাম যে, সে-সব ফেলে পিকিং যাত্রা করা সম্ভব হল না। তাঁদের লিখেছিলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু কলকাতার বন্ধুমহল থেকে কেউ কেউ বলেছিলেন, 'চলে যান মশায়'। কলকাতার চীনা কন্সলেটে ফোন করি— তারা কিছু জানত না এবং যা বললাম তার এক বর্ণও বুঝল না। যাওয়া মুলতবী হ'ল। তাঁদের লিখে দিলাম, ভবিষ্যতে যদি কখনো সুযোগ হয় আসব— কিন্তু আজ দেখছি সে সুযোগ সুদূরপরাহত— মেঘাবৃত আকাশ কবে পরিষ্কার হবে জানি না— এবং যখন হবে, তখন আমি থাকব না।

পঁচিশে বৈশাখের উৎসবের দিন রাত্রে কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি— স্পেশাল গাড়ি দিয়েছিল উৎসব-যাত্রীদের জন্য। হাওড়া স্টেশনে দেখি— হুমায়ুন কবির— সেই গাড়িতেই বোলপুরে আসছেন। হুমায়ুনকে জানি তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠিদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসতেন। প্লাটফর্মে বসে অনেক কথা হলো চীনা টেলিগ্রাম নিয়ে। পরদিন উত্তরায়ণে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরুর সঙ্গে দেখা। চীনের কথাটা তাঁকেও বললাম এবং আমি যে জবাব দিয়েছি, তাও জানালাম। তিনি বললেন, 'ভালোই করেছেন; They are so casual.' হুমায়ুন বললেন— 'ভবিষ্যতে আমরাই ব্যবস্থা করে পাঠাব। অন্যের নিমন্ত্রণে, অন্যের অর্থ নিয়ে যাওয়াটা আমরা বন্ধ করছি।'

চীন থেকে আর কোন খবর পাইনি। আমিও সব ভুলে গেলাম। হঠাৎ একদিন দেখি বিরাট এক পার্সেল এল চীন থেকে। খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর চীনা অনুবাদ দশ খণ্ড! সুন্দর ছাপা, মোটা কাগজ, ভালো বাঁধাই। চীনের সঙ্গে আমার যোগ ছিল

একদিন। তবে সে এ-চীন নয়, শাশ্বত চীনকে জানতাম। কুংফুৎসু, লাওৎসু, মেংৎসু (Mencius), হুন্‌ৎসু (Huntzu)-র চীনকে জানতাম। বিশেষ ক'রে জেনেছিলাম সেই চীনকে, বুদ্ধের বাণীকে যে বরণ করে নিয়েছিল। আজ তাদের জীবনে বোধিচিত্ত নির্বাপিত, তার স্থান নিয়েছে 'মার'।

গত বৎসর আরেকবার ভারত সরকার নিউজীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠান। কিন্তু সেবারও কি একটা অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এইভাবে তিন-চারবার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিনি। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কারণ বোধ হয় দৈহিক অস্বাস্থ্য, মনের দুর্বলতাপ্রসূত ভীতি। সেটা কেটে গিয়েছে বলেই বোধ হয় এবার রাজী হলাম— টেলিগ্রাম করলাম যাব বলে।

তারপর শুরু হ'ল দিল্লী দপ্তরের সঙ্গে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ইত্যাদির পালা। কথা ছিল, পয়লা অক্টোবর যাত্রার দিন, সেটা প্রথমে বদলে হ'ল ৫ই, তারপর সর্বশেষে টেলিগ্রামে জানা গেল যে ৯ই অক্টোবর যাত্রা সুনিশ্চিত। এদিকে আমি তো কিছুই জানিনে কি করতে হবে। দিল্লী থেকে লিখলেন— হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট চাই। আমি কলকাতায় ফিরে এসে হদিস করবার চেষ্টা করছি। সাহিত্যিক বন্ধু যাঁরা আগে গিয়েছেন— তাঁরা ফোনে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু কি কি করণীয় এবং কী ভাবে কোনটা সফল করা করা যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ করতে ভুলে গেলেন। আমি জানতাম হেল্‌থ্ অফিস আছে সুকিয়া স্ট্রীটে, যেখানে টীকা দেওয়া হয়।

সুকিয়া স্ট্রীটের হেল্‌থ্ অফিসের সঙ্গে একবার পরিচয় হয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে! গল্পটা বলেই নিই। বোলপুর থেকে আসছি— শেষরাত্রের গাড়ি, সঙ্গে স্ত্রী ও দুইটি সন্তান— উভয়েই শিশু।

গাড়িতে অসম্ভব ভিড়— কোথাও স্থান পাইনে; হঠাৎ দেখি একটা গাড়ি খালি— মাত্র তিনটি প্রাণী! সেই গাড়িতেই উঠে পড়লাম— বাঁচা গেল। বসেছি গুছিয়ে— তাকিয়ে দেখি একটি মহিলার গায়ে বসন্তের গুটি, আর এক বৃদ্ধা জ্বরে কাতর! ভদ্রলোকটি এই অবস্থায় রাতে ট্রেনে আসছেন— বৈঁচী না কোথায় যাবেন। দুটি বসন্তের রোগী— সঙ্গে দুটি শিশু। মনটা খারাপ হয়ে গেল— গুসকরাতে ট্রেন থামতেই নেমে পড়লাম— ও অন্য একটা গাড়িতে উঠলাম। কলকাতায় নেমে সোজা গেলাম সুকিয়া স্ট্রীটের হেল্‌থ্‌ অফিসে— এখন টীকা দেবার ব্যবস্থা করুন— এই তো ব্যাপার। অফিসের ভদ্রলোকটি শান্তভাবে বললেন, 'আপনি দেখেছেন বলেই মনটা খারাপ করছেন— না দেখলে তো কিছুই হত না।' হেল্‌থ্‌ অফিসের সেই সেই লোকটির কথা এখনো মনে আছে এই কথাটির জন্য।

দিল্লীর পত্রে লিখেছেন, টীকার সার্টিফিকেট দরকার। ভাবলাম, এঁরা ফুঁড়লেই হবে। গেলাম সেখানে, একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল; দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করাতে দুটি ছেলে বের হয়ে এসে বলল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তিনটার সময় আসবেন। আবার তিনটার সময় গেলাম। তাঁরা বৃত্তান্ত শুনে বললেন, এখানে তো হবে না; আপনি শ্যামবাজারে কর্পোরেশনের হেল্‌থ্‌ অফিসে যান। সৌভাগ্যের বিষয় এই অফিসের একটি ভদ্রলোক সঙ্গে যেতে রাজী হলেন; সময় কম, চারটে বেজে গেছে, অফিসের ঝাঁপ একটু পরেই পড়বে— ছোট্, ছোট্—।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে দেখি ডিরেক্টর নেই এবং তাঁর কাজ করতে পারেন এমন বিকল্প লোকও নেই। অফিসের একজন বাবু বললেন, আপনাকে সেক্রেটারিয়েটে যেতে হবে,

International Health Certficate সেখান থেকে ইস্যু হয়। আমি বললাম, ফোনে একটু খোঁজ নিতে পারি কি ? উত্তরে শুনলাম, এখানে পাবলিককে ফোন করতে দেওয়া হয় না ; নিয়ম নেই।

'চল আইন মতে !' বের হলাম। সেক্রেটারিয়েটে পৌঁছলাম। কোথায় হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট ! চিনতাম তো শিক্ষা বিভাগ। যাই হোক, দোতলায় উঠে খোঁজ করাতে একজন ভদ্রলোক একটি বেয়ারাকে দয়া করে সঙ্গে দিলেন— স্বাস্থ্যদপ্তরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য। তারপর ঘরের পর ঘর পেরিয়ে, টেবিলের ধাক্কা বাঁচিয়ে কেরানী-রাজ্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আর এক প্রান্তে গিয়ে হাজির ! সেখানকার ডিরেক্টর খুব সজ্জন, অল্প সময়ের মধ্যে ফুঁড়েফাঁড়ে সার্টিফিকেট করিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে আমি বোলপুর ম্যুনিসিপালিটি থেকে ও বিশ্বভারতী থেকে সার্টিফিকেট আনিয়ে নিয়েছিলাম। সে সব কাজে লাগল না— এঁদের লোক ফুঁড়বে, তবেই তা গ্রাহ্য হবে।

একটা হার্ড্‌ল্ পার হওয়া গেল। তারপর পাসপোর্ট। দিল্লী থেকে যদি পরিষ্কার করে লিখতেন যে, তাঁরাই পাসপোর্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা করছেন— তা হলে অনেক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতাম। পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। সময়ের আগে অর্থাৎ দশটায় গিয়েছি বলে গেটের কাছে দরোয়ানের টুলে বসে থাকতে হল। দেখি এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বুড়ি ঘোরাঘুরি করছেন, তাঁকে শুধোই কোথায় যাবেন। তিনি বললেন, পাকিস্তানে তাঁর ছেলে আছে, সেখানে যাবেন। পাশের একটি লোক বললে, 'এখানে তো সে পাসপোর্ট পাওয়া যায় না— পার্ক সার্কাসের অফিসে যেতে হবে।' বৃদ্ধা গজর গজর করতে করতে চলে গেলেন। বুঝলাম— বেচারী আমারই মত গ্রাম্য !

অফিস খুললে উপরে যাবার হুকুম পাওয়া গেল। সেখানে বসবার জন্য বেঞ্চ পাওয়া গেল। সামনে একটা টেবিলের ধারে একটি বালিকা বসে; তিনি কাগজপত্র সই করিয়ে প্রধানের কাছে পাঠাচ্ছেন। প্রধানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন— দিল্লী থেকে তো কোন খবর তাঁরা পাননি; যাই হোক, তিনি টেলিগ্রাম করছেন। ভদ্রলোক তখনই স্টেনোকে ডেকে ডিক্‌টেট করলেন— আমার কাছে যে টেলিগ্রাম এসেছিল সেটাও উদ্ধৃত করলেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত এম্বেসিতে যাই— তাঁরা কিছু জানেন না। তবে কিছু বই দিয়ে বললেন— গরম কাপড় চোপড় ভাল করে নেবেন। একটা ওয়াটার প্রুফ চাই এবং ছাতা থাকলেও ভাল।

দিল্লী থেকে খবর এল, পাসপোর্ট প্রভৃতি দিল্লী থেকেই হবে— অবিলম্বে ফোটো তিনকপি যেন পাঠানো হয় এবং International Health Certificate সেই সঙ্গে দরকার। চলো ফোটোর দোকানে, বস আলোর মুখে, তোলো ফোটো। পরদিন সন্ধ্যার মুখে ফোটো পাওয়া গেল— পাঠাতে হবে দিল্লী। ডাকঘর তো এখন বন্ধ। হ্যাঁ, এখন তো শ্যামবাজারের ডাকঘর খোলা— রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। ভাগ্যে সেজছেলের কনিষ্ঠ শ্যালক উপস্থিত ছিল। সে তদ্বিরী ছেলে। তাকে টাকা দিলাম, রেজিস্টারী চিঠি পাঠাবার জন্য। আমার আকৃতি ও প্রকৃতি অর্থাৎ আমার ফোটো ও হেল্‌থের খবর দিল্লী দপ্তরে চলে গেল। সেটা না হলে উড়োজাহাজে উঠতেই দেবে না। দুই নম্বর হার্ডল্‌ পেরনো গেল।

এবার ট্রেনের ব্যবস্থা। পুজোর মুখে হাজার হাজার লোক চলছে পশ্চিমে— কেউ ছুটিতে যাচ্ছে বাড়ি, কেউ বেরিয়েছে

বেড়াতে। কিছুকাল থেকে বাঙালী দেশভ্রমণে যাচ্ছে— আগে তাদের পিতৃপিতামহরা যেতেন তীর্থদর্শনে।

পুজোর মরশুম! ট্রেনে টিকিট পাওয়া যে যাচ্ছে না। রাত থাকতে উঠে সার দিয়ে দাঁড়াতে হয়— শেষ পর্যন্ত অনেককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় সেদিনের মত। দশদিন আগে টিকিট সংগ্রহ না করলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। কত লোককে, কত ছোট বড় মাঝারি কর্মচারীর কাছে অবস্থাটা জানালাম। একজন বললেন, তাঁর এক আত্মীয়কে টিকিট নেবার লাইনে কে একজন হাত কামড়ে দিয়েছিল। সংবাদটা কাগজেও বের হয়েছিল। দিল্লীতে লিখলাম— ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, কি করব। টেলিগ্রাম এল, না পাওয়া গেলে প্লেনে আসুন। ইতিমধ্যে টিকিটের চেষ্টা চলছে। একজন আশ্বাস দিলেন, তাঁদের জানাশোনা লোক আছে, ব্যবস্থা হবে। বুঝলাম, সদর দরজা ছাড়া খিড়কির দরজা আছে। শুনেছি, অনেক বড় বড় কাজকর্ম খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে হাসিল করে আনা যায়। তগ্‌দির ও তদ্বির ছাড়া কাজ হয় না। অদৃষ্টে যদি থাকে তবে হয়, আর সুপারিশ করার লোক যদি উপরতলায় থাকে, তবে কাজ হাসিল হয়। এত হাঙ্গামা হত না, যদি সরকার থেকে একটা কোটা বাঁধা থাকত— আমাদের মত আনাড়ীদের হয়রানি কম হত। মানসিক উদ্বেগের জন্য যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি।

আমার এক রসিক বন্ধু বললেন যে যুগটা হচ্ছে ঘুসোঘুসির যুগ। আমি তাকে বললাম, ভায়া, বক্সিং শিখিনি— ওটা পারব না। বন্ধু বললেন, হয় বাঁ হাত দিয়ে ঘুষটা দাও, না হয় ডান হাতের বজ্রমুষ্টির ঘুসি নাকে লাগাও— তবেই কাজ হবে। কোন্ কাজটা শান্তভাবে ভদ্রভাবে নিষ্পন্ন হয়?

অবশেষে ৫ই অক্টোবর যাওয়া স্থির হল। বিকালে দিল্লী মেল-এর একটা স্পেশাল দিয়েছে— তাতে আসন পাওয়া গেল। মজার কথা, হাওড়ায় এসে দেখি, আমাদের কামরায় একটা সিট খালি পড়ে আছে! অথচ স্থান নেই শুনছি রোজ। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম— ৮ই রবিবার ছুটি; অতএব একটা ঠিকানায় যেন পৌঁছে খবর দিই। ৮ই কেন, ৭ই-ও ছুটি— দশহরার উৎসব, সেটার খেয়াল ছিল না বোধ হয়; দিল্লীতে গিয়ে টের পেলাম। বৃহৎ কর্মে দুই-একটা ভুল হয়! তা না হলে পয়লা থেকে ৫ই, ৫ই থেকে ৯ই দিন পরিবর্তন হবে কেন?

২

৫ অক্টোবর ১৯৬২

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। বিদেশে যাচ্ছি, সকলেই এলেন বিদায় দিতে। পুত্র পুত্রবধূদের উৎসাহ বেশি, বাবা সোভিয়েত দেশে যাচ্ছেন— তারা গর্বিত। কিন্তু ঘরের লোকটির মুখে হাসি নেই ; এরোপ্লেনে তো দুর্ঘটনা লেগেই আছে— যদি—। যাওয়ার কথাবার্তা যখন চলছে তখন মৃদু আপত্তি করে বলেছিলেন— সত্তর বৎসর বয়সে অতদূর যাওয়া···। কিছুকাল থেকে আমি যেখানে যাই তিনি সঙ্গে যান। কিন্তু এবার তা হবে না। আমি কলকাতা থেকে একবার লিখেছিলাম, 'কত লোক তো আসছে-যাচ্ছে, কোনো দুর্ঘটনা তো এ লাইনে হয়নি ; তা ছাড়া রুশ পাইলটরা খুব হুঁশিয়ার বলে শুনেছি। তবে যদি কিছু ঘটে তো আর দেখা হবে না, তখন বেয়াল্লিশ বৎসরের স্মৃতি বহন করো···।' মোট কথা, আমার মনে এতটুকু সংশয় বা উদ্বেগ হয়নি।

স্টেশনে এসে দেখি ট্রেনে রিজার্ভেশন হয়েছে। আমার শোবার জায়গা উপরে দিয়েছে। এ বয়সে প্যারালাল বারের মত করে অথবা আরও অঙ্গভঙ্গি করে হাঁচড়ে-মাচড়ে বাঙ্কে চড়া আমার সাধ্য নয়। একজন ভদ্রলোক কানপুর যাচ্ছেন, তিনি বললেন, "আমি উপরে যাব, আপনি নীচেই থাকুন।" প্রথমে মনে হয়েছিল, লোকটি বাঙালী, পোশাক-পরিচ্ছদ বাঙালীর মত, কথাবার্তায় বোঝা যায় না যে, তিনি মাড়োয়ারী। বললেন, তিন পুরুষ হয়ে গেল কলকাতায়। ঘর-বাড়ি এখানেই। সঙ্গে বাঙলা 'দেশ' পত্রিকা ও হিন্দী ফিল্মের পত্রিকাও। রঙের ব্যবসায়ী ; ব্যবসা উপলক্ষে কানপুর যাচ্ছেন। আমার পাশের জনটি পঞ্জাবী, কলকাতায়

ক্যাবিনেটের দোকান আছে। ব্যবসায়ে উন্নতি করেছেন। তবে বলে ফেললেন, ধনী একশ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন— তাঁদের নিয়েই মুশকিল। আসেন মোটরে করে, নিয়ে যান নূতন বাড়িতে— তার জন্য ফার্নিচার চাই। বড় বড় কথা। কাজ তো করলাম, তারপর টাকা নিয়ে হল হাঙ্গামা। প্রথমে ঠিকমত হয়নি বলে ছুতো, তারপর পাঁচ হাজারের জায়গায় এক হাজার দিলেন, বললেন, পিছে হবে। কি হয়রানি! আমি এখন ঐ জাতের সঙ্গে কারবার বন্ধ করে দেব ভাবছি। কিন্তু কি করব, তাঁরাই তো কলকাতার বার-আনির মালিক। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এক কাঠা জমি কিনতে তাঁদের বাধে না। বাঙালী কোথায়! ইত্যাদি।

বর্ধমানে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পর। স্টেশনে দেখি, বড়ছেলে, বউমা, নাতি ও আরও অনেকে উপস্থিত। সুমন্ত্র চুপচাপ থাকে। সে বলে, দাদাই বাড়ি থাকলে বাড়ি গম্‌গম্ করে, আর দাদাই না থাকলে বাড়ি ছম্‌ছম্ করে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা ধুলো আর শব্দ, কয়লার গুঁড়ো আর ঝাঁকানি। প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে এ রকম ঝাঁকানি হয় জানতাম না। আমি হেসে সহযাত্রীদের বললাম, আমরা rocking horse-এ বসে আছি মনে হচ্ছে। বুঝলাম, স্পেশাল ট্রেন এটা। পায়খানা-তথা স্নানাগারে ঢুকে ভাবলাম স্নানটা করে নিই। ঝাঁঝরা আছে, জল পড়ে না। একটি স্টেশনে জানালাম, লোক এল, ঠুক্‌ঠাক্ করে চলে যাচ্ছে— বললাম, শাওয়ার খোল: ঠিক হয়েছে কি না দেখি। দেখা গেল, জল পড়ছে না। তখন আবার হৈ চৈ করাতে মিস্ত্রী উঠে রীতিমত মেরামতি শুরু করে ঠিক করে দিল। ট্রেন চলেছে। কাজ শেষ হলে মিস্ত্রী কাগজে লিখে দিতে বলল। লিখলাম, 'আশ্চর্য লাগছে,

এ ট্রেন যেখান থেকে আসছে সেখানে যথাবিধি দেখা হয়নি।' সহযাত্রীরা খুশি— আনন্দচিত্তে স্নান করে এলেন। একজন বললেন, 'এ তো ট্রেনের কামরা। মনে নেই— ভাঙা ইঞ্জিন জোর করে পাঠানো হয়েছিল— ড্রাইভার চালাবে না, তাকে চার্জশীটের ভয় দেখিয়ে ট্রেন চালাতে বাধ্য করা হয়! পথে ইঞ্জিন ধ্বংস হল, সেও মলো তার সঙ্গে মলো অনেক রেলযাত্রী। মশায়, এরোপ্লেনের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী পাইলট না গ্রাউণ্ড-ইঞ্জিনীয়ার? বলতে পারেন?'

বড় বড় দেশী-সাহেবরা অফিস করেন বাঁধাধরা বা রুটিন-মাফিক। কাজ করে নিম্নশ্রেণীর কুলিক্লাস — উপরের কর্মচারীরা সহি দিয়ে নিশ্চিন্ত হন! কিন্তু কাজটার মধ্যে টেকনিক্যাল গাফিলতি থাকল কি না, তা ধরা পরে দুর্ঘটনার পরে— অথবা গাফিলতিটা চাপা দেওয়া হয়।

৬ই সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছলাম। কনিষ্ঠ পুত্র স্টেশনে এসেছে নেবার জন্য। মালপত্র নিয়ে স্টেশনের বাইরে গেলাম— ট্যাক্সি আর পাইনে। মনে হল, শিয়ালদহ স্টেশনে ফিরে গেছি— ট্যাক্সি ধরার জন্য ছোট্ ছোট্, ধর্ ধর্। বিশ্বপ্রিয় ছুটছে ট্যাক্সি ধরার জন্য; অবশেষে অনেকগুলো ফসকে যাবার পর একটা পাওয়া গেল। মনে হল Imperial village বটে! কিন্তু শহরের ভিতর এমন অবস্থা নয়। সেখানে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে গাড়ি থাকে পঞ্জাবীদের; টেলিফোন আছে গাছে টাঙানো; সেখানেই ঘর-বাড়ি, খাটিয়া, চাটাই, হাঁড়িকুড়ি। ফোনে ডেকে বলে দাও, গাড়ি চাই অত নম্বর বাড়িতে, — পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি দরজার কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়বে। কিন্তু স্টেশনে কোনো নিয়ম নেই বলেই তো মনে হল। আর নিয়ম থাকলেও তা প্রতিপালিত হবার ব্যবস্থা শিথিল।

ট্যাক্সি মিলল, যেতে হবে বহুদূর— ইস্ট-পাটেলনগর। পুরানো দিল্লী ভেদ করে দরিয়াগঞ্জের মধ্য দিয়ে চলেছি। মনে পড়ল, প্রথম যেবার দিল্লী আসি— সে কি আজকের কথা! ১৯১৬ সালে দিল্লীতে এসেছি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে। দিল্লী ও জয়পুরের ছাত্র ছিল, তাদের গার্জেন হয়ে আসি। অভিভাবকরা খুশি হয়ে খরচ দিতেন যাওয়া-আসার ; এমন কি বলতেন, থেকে যান, স্কুল খুললে নিয়ে যাবেন। সেবার উঠেছিলাম দিল্লীর চকবাজারে— হেম সেনের দাবাইখানাতে। এই দাবাইখানা ছিল বিখ্যাত। তাঁরা দোকানের পিছনেই বাস করতেন। তাঁদের বাড়ি এখন কোথায় জানিনে। মনে আছে, সে বাড়ির কাছেই ছিল সেই বিখ্যাত চাঁদনীচকের মসজিদ, সেখানে বসে নাদিরশাহ দিল্লীর নরহত্যার হুকুম দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে, চখতাই-এর ছবি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে আওরঙজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে এক দস্যু-সর্দারের আক্রমণ রুখতে পারার শক্তি ভারতীয়দের লোপ পেয়েছিল।

মনে পড়ছে— দিল্লীর ট্রাম, ম্যুজিয়মে রাখার মত পদার্থ ; একদিন সখ করে উঠেছিলাম সেবার। নূতন দিল্লীতেও সেবার ছিলাম দিন দুই— সেক্রেটারিয়েটের বড় চাকুরে মিঃ সেনের বাসায়। মিঃ সেনের দুই ছেলে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্র ; তারা এসেছিল আমার সঙ্গে। নূতন দিল্লী বলতে আজকার নয়াদিল্লী বুঝায় না। ১৯১৬ সালে নয়াদিল্লীর পত্তন হচ্ছে মাত্র, অস্থায়ী রাজধানী গড়া হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যদিকে— সেখানে আজ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেই সময়ে তৈরি বড়লাটের প্রাসাদ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে পরিণত হয়। নয়াদিল্লী তখন তৈরি হচ্ছে।

সেবারই দেখি কুতবমিনার, উপরেও উঠি। কুতবমিনারের অন্ধকার ঘুরানো সিঁড়িতে কত শত বৎসরের কত লক্ষ নরনারীর

অশ্রুত পদধ্বনি, কত অশরীরী দেহের চলাফেরা যেন অনুভব করছিলাম! পুরানো কথা, ভুলে-যাওয়া ঘটনা চকিতে মনের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে— স্বপ্নের এক মুহূর্তে বহুকালের ঘটনাপুঞ্জ যে বেগে চলে, তার গতি বোধ হয় আলোকের গতি থেকেও বেশি, তা না হলে মনের উপর দিয়ে এত ছবি, এত কথা কেমন করে ভেসে যায়। ট্যাক্সি চলেছে।

এই না কুইন্স গার্ডেন! মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ দিল্লীতে এলে ম্যুনিসিপালিটি অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করে, সাহেব চেয়ারম্যান অনুমতি দেননি। এই কুইন্স গার্ডেনে ভারতীয়রা কবির সম্বর্ধনা করেন— আসফ আলি, দেশবন্ধু গুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন উদ্যোগী। আসফ আলি স্বাধীন ভারতে গবর্নর পর্যন্ত হন; আর দেশবন্ধু গুপ্ত কলকাতার কাছে এরোপ্লেনে দুর্ঘটনায় পুড়ে মারা যান।

ট্যাক্সি চলেছে দরিয়াগঞ্জের ভিতর দিয়ে। ১৯৪৮-এ আসি দ্বিতীয়-বার। এখানে থাকি ভাইপোর বাসায়— সে তখন শ্রীরামের সেবক, এখন রাজস্থানের বড় চাকুরে। তখনকার রাস্তা কী সরু ছিল! এখন ব্রডওয়ে, দোকানে-হোটেলে জ্বলজ্বল করছে। ঐশ্বর্য উছলে পড়ছে! কে বলে এ দেশ দরিদ্র? সেবার লালকেল্লা প্রথম দেখি ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমবার লালকেল্লায় ঢুকতে পাইনি। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। পুলিসের হুকুম ও পাস ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। দূর থেকে দেখেছিলাম, গেটের কাছে লালমুখো সিপাহী বন্দুকে সঙীন চড়িয়ে টহল দিচ্ছে। কাছে যেতে সাহস হয়নি; তখন লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা চলছে— বাঙালীর উপর সন্দিগ্ধ চোখ! তারা বিপ্লবী। দিল্লী স্টেশনে নামবার সময়ে তাই মাথায় পাগড়ি পরি; গায়ে কোট, মালকোচা আঁটা ধুতি। এবার স্বাধীন ভারতের দিল্লীতে এসেছি। সে সব হাঙ্গামা নেই, তাই নির্বিঘ্নে ও

নির্জনে দেখে এলাম মোগল গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন— রবীন্দ্রনাথের নবজাতকের একটি কবিতা মনে পড়ল—

"ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়।"

মোটর চলেছে— ভিড় বাঁচিয়ে, পাশ কাটিয়ে, অন্যমনস্ক পদচারীকে চমক লাগিয়ে মোটর চলেছে হাঁক দিতে দিতে। ইস্ট-পাটেলনগরে পৌঁছলাম— একটা বাড়ির পিছনে। বিশ্বপ্রিয় নেমে উপরে গেল— ফিরে এল, জিনিসপত্র নিজেই তুলল দোতলায়। আমি ভাবছি তারই বাসায় উঠেছি। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখি একটি ক্ষীণাঙ্গী শ্বেতকায়া বিদেশিনী এসে আমাকে অভ্যর্থনা করছেন। মহিলার স্বামী বাঙালী— অসুস্থ বলে লণ্ডনে গেছেন চিকিৎসার জন্য। ফরাসী স্ত্রী তাঁর ছোট ছেলে নিয়ে এই বাড়িতে থাকেন। আলায়েঁস ফ্রাঁসেতে সন্ধ্যায় ফরাসী ভাষা পড়ান, তাতে তাঁর চলে যায়। শ্রীমতী যখন বিকালে ক্লাস নিতে যান, তখন অনসূয়া নামে একটি বাঙালী মেয়ের উপর ছোট ছেলেটিকে দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। মেয়েটি সকালে কলেজে পড়ে— বিকালে এই কাজ করে। ভালই মনে হল, এ ধরনের কাজ করে খরচ চালাচ্ছেন।

দুইদিন এখানে থাকলাম, বাড়ির মতই লাগল। ছেলেটি বিশ্বপ্রিয়র খুব ন্যাওটা ; আংক্‌ল্ তাকে শোকোলাৎ দেয় বলে খুব খুশি। ওর শোকোলাৎ কিন্তু চকোলেট নয়, আমসত্ত্ব। বিশ্বপ্রিয় আমার সঙ্গে থাকছে— তার নিজ বাসা খুব দূরে নয়।

এ বাড়ির মালিক ডাঃ বিন্দ্রা, পঞ্জাবী শিখ— সপরিবারে একতলায় থাকেন। বিন্দ্রাকে দেখলাম— সকালবেলায় স্নান করে কাপড় মেলছেন। পরে পরিচয় হয় সবার সঙ্গেই। ছেলেদের একজন মিলিটারীতে আছে, অপরজন মিলিটারী শিক্ষানবীশ। এরা জাতলড়িয়ে। গুরুগোবিন্দ সিংহ শুধু ধর্মসংস্কার করেননি,

তিনি একটা বিচ্ছিন্ন জনতাকে যোদ্ধৃজাতে পরিণত করে গিয়েছিলেন। মুঘল বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে লড়াইটাই হয়ে উঠল নেশা ও পেশা। জোনাকির আলোর মত রণজিৎ সিংহকে দেখা গেল কিছুকালের জন্য— তারপরেই ঘোর অন্ধকার নেমে এল পঞ্জাবে। অচিরকালের মধ্যে শুরু হল নিজেদের মধ্যে ঝুটোপুটি। তারপর পঞ্জাবটাকে একদিন ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়ে— শিখরা নিশ্চিন্ত মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফৌজে ঢুকে পড়ল। ইংরেজ নিশ্চিন্ত। শিখেরা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একজন শিখ সর্দারকেও বিপ্লবপন্থী হতে দেখা গেল না; আট বছরের মধ্যে মহিষ মেষ হয়ে গেল। তারপর একদিন লড়াই-এর নেশায় পাগলরা সরকার সালাম করে কৃতার্থ হয়ে ব্রিটিশ সেনাপতিদের বেত্রসঙ্কেতে কুচকাওয়াজ করে চলে— সিঙাপুরে, সাংহাইতে, কলম্বোতে।

ভারত-পাকিস্তান পার্টিশনের পূর্বে শিখদের মুরুব্বী তারা সিং ভেবেছিলেন, ইংরেজ পঞ্জাব পেয়েছিল শিখদের কাছ থেকে— মুসলমানদের কাছ থেকে নয়। তাই ভারত ছাড়বার সময় তারাই হবে ইংরেজের উত্তরাধিকারী! এই নিয়ে লাহোরে কি তড়পানিই চলেছিল— ১৯৪৭-এর পূর্বে। বুদ্ধিমান লোকেরা তারা সিংকে শান্ত হতে উপদেশ করেন, কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন, ধর্মের জিগির তুলে জিন্না সাহেব পাকিস্তান আদায়ের চেষ্টায় আছেন, আমিই-বা ধাপ্পা দিয়ে শিখস্থান না পাব কেন? মুসলমানরা সাতশ' বছর ভারতে আছে— রাজনীতি কাকে বলে, তা তারা ভাল করেই জানে। দাবা খেলবার সময় হাতি ঘোড়া রাজা মন্ত্রী মারা পড়ে বোড়ের চালে। সেই বোড়ের চালে পাকা-খেলোয়াড় জিন্না সাহেব জয়ী হলেন— শকুনি মামার কান-ফুসফুসানি ছিল সাগরপার থেকে।

তারা সিং সেই পথ ধরে ভেবেছিলেন, তুলোভরা গদা ঘুরিয়ে ব্রিটিশকে ভয় দেখাবেন, মুসলমানকে কাবু করবেন! কূটনীতিতে ভারতীয় হিন্দু ও শিখরা শিশু। কূটনীতি-ওস্তাদ মুসলমানেরই জয় হল— বিনা রক্তপাতে, বিনা সংগ্রামে স্বাধীন রাজ্য লাভ করল। শিখদের দেশ ছেড়ে পালাতে হল। তারা আশ্রয় পেল ভারতে--- কিন্তু লড়াই-এর নেশা গেল না ; তাই এ দেশে এসেই রব তুলল পঞ্জাবী সুবা চাই।

পঞ্জাবীরা ভারতে এসে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে— কেউ বেকার নেই। শিয়ালদহ স্টেশনে হা-ঘর, হা-ঘর করে ফুটপাতে ঘর (?) বানিয়ে দিন কাটাচ্ছে বাঙালী উদ্বাস্তু। সমস্ত ভারতময় শিখরা ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তরভারতে Motor Transportকে শিখরা নিয়ন্ত্রণ করছে। পঞ্জাবের বাইরে তারা এসে ব্যবসায়, ঠিকেদারিতে লেগে গেছে— সরকারী ডোল পাবার জন্য বসে নেই। দেশের বাইরে এসে ভাষা সংস্কৃতি তাদের নষ্ট হয়নি। গ্রন্থসাহেবকে মোটরে চাপিয়ে যখন তারা কলকাতা শহরে মিছিল করে খোলা তলোয়ার কাঁধে করে— তখন কি মনে হয় যে, তারা তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম হারিয়েছে? যত ভয় বাঙালীর! 'দণ্ডকারণ্যে যেয়ো না, আন্দামানে যাবে না— সমস্ত কলকাতার আশেপাশে ভিড় করে বসে থাকো'— বিশেষ বিশেষ দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ব্যবহার করা হবে বলে তাদের জিইয়ে রাখা হয়! হায় রে মানব-প্রীতি!

৩

দিল্লী

৭ অক্টোবর ১৯৬২

বিশ্বপ্রিয় যে বাসায় থাকে— তার দোতলায় থাকেন ডক্টর তারেশ রায়। ইনি এককালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন। এঁর বাড়ি থেকে মিস্ কিচ্‌লুকে ফোন করলাম তাঁর ফ্ল্যাটে। এঁর সঙ্গেই এতদিন পত্রাদির বিনিময় চলছিল সোভিয়েত সফর নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে পাওয়া গেল ফোনে। আগমনবার্তা ঘোষণা করলাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, পাসপোর্ট প্রভৃতি সব ঠিক আছে, ৯ই সকালে সওয়া ছ'টার মধ্যে পালাম বন্দরে পৌছতে হবে ; সেখানে কাগজপত্র সব দেবেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সেদিন দুপুরে বাইরে লাঞ্চ করলাম, বিশ্বপ্রিয় সঙ্গে ছিল। সকালে চা খেয়েছিলাম এক আর্মেনিয়ানের দোকানে, সেখানে ভোজ্যপদার্থ গরম ও ঠাণ্ডা রাখার দু'রকমের বন্দোবস্ত আছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। বিশ্বপ্রিয় শুধাল, 'আর্মেনিয়ান কোথা থেকে এদেশে এল ?' বললাম, এরা জাত-ব্যবসায়ী। ভারতে বহুকাল আছে, আকবরের এক রানী ছিলেন আর্মানী খ্রীষ্টান। আর্মানীটোলা রাস্তা আছে ঢাকায়, কলকাতায়। এককালে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কলকাতায় তাদের চার্চ আছে। বহরমপুরেও পুরানো ভাঙা গীর্জা এখনো দেখা যায়। বিশ্বপ্রিয়কে বললাম, তোমার মনে আছে কি, একবার চাকদহ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেগ্‌লার সাহেবের পোড়ো বাড়ি দেখতে যাই। ইনি আর্মেনিয়ান ছিলেন। এই বেগ্‌লার সাহেবকে ছোটবেলায় দেখেছিলাম ; বাবার কাছে আসতেন মামলা-মোকদ্দমা

৮-১৪৭

নিয়ে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতেন টলতে টলতে, ভীষণ মদ খেতেন। আমাদের দেশের বাড়ি থেকে বেগ্‌লারের বাড়ি আধ ক্রোশের মধ্যে। দাদা ও আমি যেতাম মাঝে মাঝে। তাঁর বিরাট লাইব্রেরী ছিল— ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দাদা একটা বই এনে সেই গল্পটা নিয়ে একটা গল্পই লিখে ফেললেন। বিশ্বপ্রিয় বললে, 'ইনি কি সেই বেগ্‌লার, যিনি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করেন?' আমি বললাম, ঠিক ধরেছ। ছোটবেলায় বেগ্‌লারের বিদ্যাবত্তার কথা জানতাম না, তবে তাঁর বাড়ি ও বাগানের চারিদিকে বুদ্ধের মূর্তি ও স্থাপত্যের নিদর্শন দেখেছিলাম, তা মনে আছে। বড় হয়ে তাঁর কথা জানতে পারি। ইনি কানিংহাম সাহেবের সহকারীরূপে কাজ করতেন, তারপর কি করে যে তাঁর পতন হল জানিনে। আজ বেগ্‌লারের অস্তিত্বের কথা বোধ হয় চাকদহবাসীরা ভুলে গেছে। এই প্রথম আর্মানী দেখি। আর আজ এই দোকানী আর্মানীকে দেখলাম।

সেদিন বিকালবেলায় শ্রীযুক্ত দাসের বাসায় গেলাম, পুরানো পরিচয়। সেখানে গিয়ে শুনলাম, আমেরিকা থেকে প্রফুল্ল মুখুজ্জে ও তাঁর ভাই এসেছেন বহু বৎসর পরে। আমেরিকায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন প্রফুল্ল মুখুজ্জে। দিল্লীতে কেম্‌ব্রিজ স্কুলের স্বত্বাধিকারী অধ্যক্ষ অলোক দেবের বাড়িতে তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা মিলিত হবেন তাঁদের স্বাগত করবার জন্য। আমি এঁদের জানতাম। তাই চললাম শ্রীদাসের সঙ্গে তাঁদের গাড়িতে। সেখানে বহু পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল। সোভিয়েত দেশে যাচ্ছি বলে সকলেই অভিনন্দিত করলেন। গল্পগুজব হাসিগানে সন্ধ্যাটা কাটল। প্রফুল্ল মুখার্জিরা আমেরিকা থেকে লণ্ডন ও মস্কো হয়ে আসছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে শোনা গেল কিছু কথা, তবে খুব বেশি নয়।

শ্রীদাসের গাড়িতে ফিরছি। শুনলাম কালীবাড়িতে বাঙলা পুস্তক প্রদর্শনী হচ্ছে। সময়টা ভাল বাছা হয়নি। পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপূজা; বাঙালীদের সকলেরই মন পড়ে আছে পূজামণ্ডপের হৈ-চৈ ও তামাশায়। মন্ত্রী দিয়ে প্রদর্শনী উদ্বোধন করালেও মন কি পাওয়া যায়। শুনেছি প্রদর্শনীতে তেমন লোক ও বেচাকেনা হয়নি।

উৎসবমুখরিত নগরের শোভা দেখতে দেখতে বাসায় ফিরলাম—তখন বেশ রাত হয়েছে।

৪

দিল্লী

৮ অক্টোবর ১৯৬২

আজ দশহরা বা দশেরা। সন্ধ্যার দিকে বের হলাম দশহরার দশ-দশা দেখবার জন্য। দশ দফা পাপ হরণ করবার জন্য গঙ্গাদেবীর জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে— ইতিপুরাণ-কথা বা শাস্ত্রকথা। কিন্তু সেটা কার্তিক মাসে কার্নিভালে পরিণত কি করে হল ভেবে পাইনে। দশেরার উৎসব দু'বার দেখেছি এলাহাবাদে। আজ দিল্লীতে ঘুরছি শহরের পথে পথে। ফাঁকা জায়গায় রাবণের বিরাট মূর্তি করে পোড়ান হচ্ছে— বাজি পুড়ছে, বোমা ফাটছে। রাস্তার দু'পাশে দোকান ফলে, ফুলে, ভোজ্য-পানীয়ে পূর্ণ। নরনারী, বালক-বালিকারা তাদের সেরা সুন্দর পোশাক পরে বের হয়েছে— দলে দলে চলেছে। চলার জন্যই চলা— চলার মধ্যে যে অহেতুকী আনন্দ আছে তা বহুকাল হারিয়েছি। এখন কাজের তাড়ায় চলতে হয়, চলার বেগে এখন পায়ের তলায় রাস্তা জাগে না। জনতার পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র— অধিকাংশক্ষেত্রে প্যাণ্ট, শার্ট। ধুতি, পাজামা, দেশী কুর্তা-পরা লোক পঞ্চমের দলভুক্ত। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আমাদের ন্যাশনাল পোশাক প্যাণ্ট, শার্ট, কোট হয়ে গেছে। মুসলমানী দরবারী পোশাকের অনুকরণে গায়ে আচকান, পরনে যোধপুরী আঁটা পায়জামা, মাথায় গান্ধী টুপি চাপিয়ে একটা ক্যামিলিয়নী জাতীয় পোশাক করেছি বটে, তবে তাও সর্বদেশ গ্রহণ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের বড়-মেজরা এই পোশাক পরেন-- কিন্তু অবশিষ্টরা পাশ্চাত্ত্য পোশাক পুরোপুরি নিয়েছি— মায়-কণ্ঠলংগোটি। লংগোটি নাম শুনেও কারো ও

জিনিষটা পরতে ঘেন্না হল না। একবার স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানীর থেকে স্টার থিয়েটরে রবীন্দ্র-উৎসব করে; আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। গিয়ে দেখি, সভায় মাড়োয়ারী বণিক পনের-আনি দর্শক, কিন্তু একজনেরও পরনে মাড়বারের জাতীয় পোষাক দেখলাম না; কারো মাথায় পাগড়ি নেই। সকলের পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক— মায় রঙবেরঙের টাই! জয়পুরে গত বৎসর গিয়েছিলাম — সেখানে দেখি 'সভ্য'দের মধ্যে দেশী পোশাক অদৃশ্য হয়েছে। পুষ্করতীর্থ থেকে ফিরতি জনতার দেহে ও শিরে রঙের বাহার দেখেছিলাম। সেই বিচিত্র রঙের সৌন্দর্য দেখে মনে হয়েছিল, এরা যেন সভ্য না হয়। কিন্তু তারা ভাবছিল হয়তো ঠিক উল্টো কথা। এইসব গ্রাম্য জবড়জং পোশাক ছেড়ে বেশ ফিটফাট সাহেবী পোশাক কবে ধরবে। মোটকথা— একদিন যেমন আমরা মুসলমানদের পোশাক পরেছিলাম, আজ তেমনি পাশ্চাত্য আবরণে দেহ আচ্ছাদন করছি। মুগলযুগে আকবর ও প্রতাপ সিংহ এবং আওরঙজেব ও শিবাজীর পোশাক একই ছিল। এখনো তাই। তবে এখন দুনিয়ার সর্বত্র এই পোশাকই লোকে পরছে, সুতরাং হৃষ্টমনে সেটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম। কিন্তু মেয়েরাই দেশের ধারা রক্ষা করে আসছে— শাড়ি পরে। তবে slacks পরা মেয়েও দেখেছি— তাদের দিকে তাকানো যায় না। অনুকরণ কতদূর যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই মহানগরে দেখলাম। সুন্দরীদের সুন্দর পোশাক পরার অধিকার নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সুন্দরের কি মাপকাঠি নেই? দেশ-কাল-পাত্র কিছুরই বিচার করতে হবে না? বীট কবিদের কবিতার মত তাদের পোশাক, তাদের খানাপিনা তারও অনুকরণ করতে হবে আধুনিকতার দোহাই পেড়ে? নাইলন আর কত সূক্ষ্ম হবে?

দিল্লীর আলো-আঁধার রাস্তায় ঘুরছি। রাবণের দেহভস্ম তখন ধূমায়মান— উৎসাহী দর্শকের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। জানি না কোন দেশের কোন এক সম্প্রদায় কবে ঘোষণা করে বসবে, তাদের 'হিরো' বা বীরকে অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে— জিগির তুলবে— বয়কট কর, উৎসব বন্ধ কর। তখন একপক্ষে রাবণ পোড়ানো হবে ধর্মের অঙ্গ, অপরপক্ষে সেটা বন্ধ করা হবে পুণ্যকর্ম। বাধুক হাঙ্গামা।

ষোড়শ শতকে আঁকা হজরত মহম্মদের দুষ্প্রাপ্য ছবি বহুব্যয়ে বিলাত থেকে সংগ্রহ করে পাঠ্যপুস্তকে ছাপিয়ে লেখক-প্রকাশক মনে করেছিলেন, তাঁদের বই মুসলমান-প্রধান বাংলা দেশের স্কুলে মক্তবে খুব কাটবে। কিন্তু হজরতের ছবি দেখে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এক বড়হি বা ছুতারের ছেলেকে আনিয়ে প্রকাশক ভোলানাথ সেনকে দিবালোকে হত্যা করান; কারণ কাফেররা হজরতের ছবি ছেপেছে। ক্ষতি! সর্বনাশ! কিন্তু আসল কথা ছবিটা মুসলমানেরই আঁকা। তবে সে মুসলমান শিয়া— আর এরা সুন্নি! শুনেছি— ভগবান বুদ্ধদেব সেজে আর অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে নামতে পারছে না। পশ্চিম ভারতের নয়া বৌদ্ধরা মারমুখো হয়ে উঠছেন। হিন্দুরা কৃষ্ণকে 'কেষ্টঠাকুর' বানিয়ে পথে পথে থালা হাতে নাচিয়ে বেড়ায়, তাতে কারও আপত্তি হয়নি। পরম আর্থিকবোধ থেকে তার উদ্ভব!

৫

দিল্লী

৯ অক্টোবর ১৯৬২

ঘড়িতে হয়েছে ভোর ; কিন্তু এখনো রয়েছে রাতের অন্ধকার। দূরের মোটরের হর্ন নিকটে আসে। থামে দরজার কাছে ; মৃদু হুংকারে জানিয়ে দেয় পালামে যাবার জন্য সে এসে গিয়েছে। কালকে রাত্রে বিশ্বপ্রিয় ট্যাক্সিস্থানে গিয়ে বলে এসেছে— ভোর পাঁচটায় আসতে হবে। ঠিক এসেছে। আমরা তৈরি ছিলাম। ডাঃ বিন্দ্রা এলেন, তাঁর ওখানে গিয়ে চা খেলাম ; গতকাল উপরে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন।

পালামের পথে গোপীনাথনকে তুলে নিলাম ; এঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয় হয়েছিল। ইনি কেরালার লোক, কট্টর কম্যুনিস্ট ছিলেন, এখন মতভেদ হওয়ায় সরে এসেছেন। 'জনযুগম' কাগজের সঙ্গে যখন যুক্ত, তখন বোলপুরে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে একটা লেখা আনতে গিয়েছিলেন আমার কাছে, আদায়ও করে নিয়ে যান।

পালামে পৌঁছিয়ে দেখি— তখন বেলা ৬টা— কৃপালানী এসে গেছেন ; নন্দিতাও তাঁর সঙ্গে এসেছেন, স্বামীকে see off করবার জন্য। কৃপালানী সিন্ধী ; আচার্য কৃপালানী তাঁর দূরকুটুম্ব। যৌবনে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পাশ করে আসেন ; কিন্তু আইন ব্যবসায়ে ঢুকতে মন গেল না। তাই গেলেন শান্তিনিকেতনে-- শিক্ষকতা করবার জন্য। বহুকাল ছিলেন সেখানে। অধ্যাপনা, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলীর সম্পাদনা, রবীন্দ্র-সদন পরিচালনা প্রভৃতি অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সহকারী কর্মসচিবেরও কাজ

করেন দীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতাকে বিবাহ করে সেখানেই সংসার পাতেন। পরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল্লীতে চলে যান। নানারকম বেসরকারী, আধাসরকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। এখন তাঁর খ্যাতি সাহিত্য আকাদেমীর সম্পাদক বলে। ঐ প্রতিষ্ঠানটা তাঁরই অদম্য চেষ্টায় খাড়া হয়ে উঠেছে। ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেও ইনি যশস্বী হয়েছেন। কৃপালানী বিদেশে ঘুরেছেন— ঘাঁতঘোত জানেন— তাই এঁকে সঙ্গীরূপে পাওয়াতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছিল, কারণ, দ্বিবেদী ও আমি একেবারে গ্রাম্য। একজন বালিয়া জেলার, অপরজন বীরভূমের। আমাদের কাছে ঘর ছেড়ে আঙিনাই বিদেশ।

হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী এসে পড়লেন সপরিবারে স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ কন্যা জামাতা এমন কি তৃতীয় বংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এখন দ্বিবেদী চণ্ডীগড়ের অধ্যাপক। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর ছিলেন হিন্দীর শিক্ষক। বিশ্বভারতীর হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার কথা স্মরণীয়। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল কাজ পেয়ে চলে যান। ধন ও মান অর্জন করে ঘরবাড়ি বানিয়ে বেশ ছিলেন। তার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাম্য' রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে পড়ে উড়ে গিয়ে সদ্য পড়েছেন চণ্ডীগড়ে। হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক তিনি। বাংলা ভাল জানেন।

একটু পরেই মিস কিচ্‌লু এলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের ছাড়পত্র। কাগজপত্র বুঝে নিলেন কৃপালানী। এলেন সোভিয়েত এম্বেসীর সাংস্কৃতিক অ্যাট্যাশে; মরোজোভ এলেন। ইনি শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস ছিলেন, বাংলা ভালই জানেন— রুশভাষা শেখাতেন সেখানে। কিন্তু বিশ্বভারতীর কেউ সে ভাষা শেখেনি। শুরু করেন জন দশ— কি উৎসাহ! কিন্তু একে একে নিবিল দেউটি—

উৎসাহের দপ্‌দপানি মিলিয়ে গেল রুশ ব্যাকরণের কড়মড়ানি শুনতে শুনতে। মরোজোভকে উপরের হুকুমে কলকাতায় চলে যেতে হল; তারপর এখন এম্বেসীতে কাজ করছেন। শান্তিনিকেতনে বড় বাড়ি ভাড়া করেন, বেশ ভাল রকম খরচ করতেন। কম্যুনিস্টরা বিদেশে বেশ আরামেই থাকে — দেশে এত আরাম পায় না। মস্কো, লেনিনগ্রাদের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে কয়েকশ' পরিবারের সঙ্গে ৩।৪ খানা ঘর নিয়ে টোঙের উপর খাঁচা ঘরে বাস। আর এখানে বিশাল বাড়ি, চাকর-বাকরের অভাব নেই। এরা এত যে খরচ করতে পারে তার কারণ এরা রুবলে বেতন পায়। একটা রুবলে পাঁচ টাকার উপর বিনিময়ে পাওয়া যায়। সুতরাং তারা ভাল করেই খরচ করতে পারে। পূর্ব জার্মানীর এক অধ্যাপক কলকাতায় এসে কিছুকাল থাকেন; তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। বাড়ি ভাড়া ৬০০্ — এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘর। চাকর বাকর, শোফার, গাড়ি সব আছে। আসল কথা বিদেশে গিয়ে কোন জাত নিজের দেশের দারিদ্র্য, দুঃখ দেখাতে চায় না।

এরোপ্লেন ছাড়তে দেরি আছে। মিসেস বিকোবা নামে এক রুশী মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। পরিচয় করিয়ে দিলেন রুশ সাংস্কৃতিক অ্যাটাশে। মিসেস বিকোবা রুশ থেকে এসেছেন— যাচ্ছেন কলকাতায়, প্রশান্ত মহলানবিশের স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউটে থাকবেন; সেখানে লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মূল্যবান সংগ্রহ আছে, তাই নিয়ে কাজ করবেন। ইনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত — রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষক। আমাকে জানেন আমার বই দিয়ে। আমরা কথা বলছি— এমন সময় মাইকে হাঁক দিল— 'কলকাতার প্লেন ছাড়বে, যাত্রীরা প্রস্তুত হন।' সুতরাং কথাবার্তা বন্ধ হল। তবে, বিকোবা বললেন—'আপনি ফিরে আসুন, দেখা

তুষার-তরঙ্গ চলছে ; হঠাৎ মনে হল, একটা অতি বিস্তৃত সমতল ভূমি। এই কি পামীর মালভূমি— ভূগোলে যার কথা পড়েছি ?

কে জানে ? কাকে জিজ্ঞাসা করব ? দু'ঘণ্টার উপর এই তুষার-তরঙ্গের উপর আমরা ভেসে চলেছি। সমতল দেখা গেল— বুঝলাম, ভারত সীমানা পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় পড়েছি।

সহযাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় কয়জন দেখলাম, আলাপ হল। তাঁদের মধ্যে দুইজন বাঙালী।— এঁরা পাঁচজন বিমান বিভাগে (এয়ার ফোর্সে) কাজ করেন, যাচ্ছেন তাসখন্দ। বুঝলাম, মিলিটারি ব্যাপার নিয়ে চলেছেন। এই যুবকদের স্বাস্থ্য, উৎসাহ, সাহস দেখে বুঝলাম, ভারতে যে নূতন প্রাণ এসেছে— এঁরা তারই প্রতীক। নানা কথা হল, কিন্তু কেন যাচ্ছেন, সে-সব প্রশ্ন করলাম না। আন্দাজ করলাম M.I.G-এর শিক্ষানবিশী করতে চলেছেন।

উজবেকিস্তানের পাহাড়, সমতল, শস্যক্ষেত, গ্রাম, শহর দেখতে দেখতে তাসকন্দের এয়ারপোর্টে নামলাম। বেলা প্রায় ১১টা তখন।

প্লেন থামল। কিন্তু তখনই নামতে পেলাম না। সকলেই বসে। দেখি দু'জন মহিলা ডাক্তার ও নার্স উঠে এসেছেন। প্রত্যেক যাত্রীর মুখে মোটা থার্মোমিটার ভরে তাপ দেখছেন— ৩৬ ডিগ্রী অর্থাৎ নর্মাল। নাড়ি টিপে দেখলেন ঠিক আছে।— মনে পড়ে, যেবার রেঙ্গুন যাই, কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বে। আমরা ষোল টাকার ডেক-যাত্রী জাহাজে উঠবার সিঁড়ির মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে— বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, বিহারী। একজন ডাক্তার এলেন— পেটে একটা ধাক্কা দিয়ে কি দেখলেন তিনিই

জানেন ; চোখের নীচটা টেনে ধরলেন, হাঁ করে জিভ দেখালাম। তারপর ছুট্ ছুট্— সিট দখল করতে হবে। মহিলা ডাক্তার ও নার্স নামবার সময়ে International Health Certificate-টা দেখলেন। এই সার্টিফিকেট জোগাড় করতে কি হয়রানি ভুগতে হয়েছিল। আর তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে সীল দিয়ে কাজ শেষ করলেন। এত মেহনতে পাওয়া কাগজটার উপর আরেকটু দরদ দিয়ে দেখ বাপু!

এয়ারপোর্টের কাছেই একটা বাড়ি— সেদিকে চলেছি, এমন সময় একটি লোক এসে ইংরেজিতে শুধুলেন আমরা সায়েন্স অ্যাকাডেমির অতিথি কি? তিনি উজবেকী মুসলমান, পোশাক-পরিচ্ছদ তদ্দেশীয়— নীল পাজামা, নীল কোর্তা, মাথায় ঐ দেশীয় টুপী, নীলের উপর সাদা সুতির কাজ। উজবেকী ভদ্রলোকের নাম মিঃ আনবার— স্থানীয় অ্যাকাডেমির সদস্য, ভূতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা আমাদের নিয়ে সেই বাড়িতে চললেন। এটা যাত্রীদের বিশ্রাম ও ভোজনালয়। তাসকন্দ হোটেল অনেক দূরে, শহরের ভিতর। প্লেন বদলাতে হবে জেনে জিনিসপত্র সব নামিয়ে এনেছিলাম। শুনলাম মস্কো-প্লেন ছাড়বে সন্ধ্যার পর, অর্থাৎ সাতঘণ্টা এই শহরে থাকতে হবে। মন্দ কি। শাপে বর হল, মধ্য এশিয়ার একটা জায়গার উপর তো চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে। অ্যাকাডেমির মোটর গাড়ি করে আমরা শহর দেখতে বের হলাম। প্রথমেই প্রাচ্য অ্যাকাডেমিতে গেলাম। আধুনিক ঘরবাড়ি সাজ-সজ্জা। অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় হল— মিঃ আনবার দোভাষীর কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উজবেকী ভাষায় গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কবির বইও কিছু কিছু ছাপা হয়েছে। নৌকাডুবির উজবেকী অনুবাদ হয়েছে রুশী তর্জমা 'ক্রুশেনী' থেকে ; তাসকন্দে ছাপা হয় (১৯৫৮)।

এছাড়াও গল্পগুচ্ছের কতকগুলি গল্পের অনুবাদ দেখলাম, সেটা ছোট বই। অধ্যক্ষ আমাদের 'বাবরনামা' বই দিলেন, তাতে মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় চিত্র তুর্কী লিপিকলার (calligraphy) ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে অলবারুণী সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে; এই মহাপর্যটকের এক মূর্তি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এ মূর্তির মূল ছবি কোথায়? তাঁরা বললেন, কল্পনা থেকে এটা সৃষ্টি করা হয়েছে।

উজবেকীদের নৃত্যকলা ও নাট্যাভিনয় বিখ্যাত, সে সব দেখার ফুরসত নেই। এরাই রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি নাট্যাকারে অভিনয় করে— গঙ্গার কন্যা (ডটার অব দি গ্যাঞ্জেস) নাম দিয়ে। এদের সরকারী থিয়েটারে অভিনয় হয়। গত বৎসর মার্চ মাসে যখন দিল্লী গিয়েছিলাম পীস ফেস্টিভালের রবীন্দ্র-উৎসবে যোগদানের জন্য, তখন ট্রাভাংকোর হাউসে রবীন্দ্রনাথের রুশ-পরিক্রমা সম্বন্ধে চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়; গিয়েছিলাম। সেখানে নৌকাডুবির চিত্রগুলি দেখানো হয়েছিল।

অ্যাকাডেমিতে মিঃ আনবারের বদলে একটি রুশ মহিলা এলেন দোভাষী হয়ে। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী পড়ান। ইংরেজিতে কথাবার্তা হচ্ছিল; কিন্তু যখন জানলাম হিন্দী শিক্ষিকা, তখন হিন্দীতে কথা শুরু করলাম। বেচারা প্রথমে খুব সঙ্কোচ করছিল। মেয়েটি উক্রেয়েনী; 'পিতাজি'র সঙ্গে তাসকন্দে এসেছিল, তিনি কাজ করেন। 'মাতাজি' Moldaviaতে থাকেন, কেন তা বুঝলাম না, জিজ্ঞাসাও করলাম না। মেয়েটি বিবাহিতা— স্বামী স্থানীয় সঙ্গীতশালায় কাজ করেন— একটি শিশু আছে। শহর ঘোরার সময় তাঁরা কোথায় থাকে দেখিয়ে দিল। শহর ঘুরছি— ফ্রুঞ্জের বিরাট মূর্তি চোখে পড়ল। ফ্রুঞ্জে (১৮৮৫-১৯২৫) নামকরা

বিপ্লবী, মধ্য এশিয়ায় জন্মেছিলেন খিরগিজস্থানের পিশ্‌পেক শহরে ; এই শহরের নাম এখন ফ্রুঞ্জে। মস্কোতে ফ্রুঞ্জে মিলিটারি অ্যাকাডেমির দশতলা বাড়ি— যেখান থেকে অনেক রণধুরন্ধর শিক্ষা পেয়ে বের হয়েছেন। ঐ অ্যাকাডেমির সামনের উদ্যানে ফ্রুঞ্জের মূর্তি আছে, মস্কোতে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে। ফ্রুঞ্জের নাম রুশে সুপরিচিত। ফ্রুঞ্জের নাম দেওয়া শহর সম্বন্ধে পড়েছি ; বিশাল শিল্পনগরী হয়ে উঠেছে। সময় ও সুযোগ থাকলে মধ্য এশিয়ার রূপান্তরটা দেখতাম। আমি জানি তাদের প্রাচীন ইতিহাস।

এককালে সে অঞ্চলের লোকে ছিল বৌদ্ধ, ধর্ম পেয়েছিল ভারত থেকে। ধর্মগ্রন্থ পড়ত সংস্কৃত থেকে, তারপর সেখানে এল ইসলাম। পুরানো পটের উপর নূতন রঙ পড়ল। আরবী হল ধর্মের ভাষা। পার্সী সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা আচার-ব্যবহার লোকের মনে নূতন প্রেরণা এনে দিল। আলো জ্বলল সমরকন্দ, বুখারা, খিভায়··· কালে জ্ঞানের ইন্ধন গেল ফুরিয়ে। নিষ্প্রভ হয়ে গেল মধ্য এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। জ্বলল সেখানে হিংসার আগুন, উপজাতিতে উপজাতিতে কলহ ও যুদ্ধ। সেই শনির ছিদ্রপথ দিয়ে রুশীয়রা এখানে প্রবেশ করে, যেভাবে ভারতে করেছিল ইংরেজ। জারের কঠোর শাসনে নিষ্পিষ্ট হল এরা। তারা না পায় শিক্ষার আলোক, না জাগে সেখানে নূতন শিল্পকলা। ধর্মের মূঢ়তা মনের উপর এনে দিল আঁধার। সোভিয়েতভুক্ত হয়ে আজ সে দেশে নানা জাতির মধ্যে আত্মচেতনা জেগেছে। নূতন শিক্ষা তাদের মনের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এখন যে শিক্ষা পাচ্ছে তা বিজ্ঞানের উপর

তাসকন্দে কত প্রতিষ্ঠানের পাশ দিয়ে গেলাম। লাল রঙের

ট্রাম, ট্রলিবাস, মোটরকার সবই আছে আধুনিক শহরে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চললাম শহরতলীতে। এখনো আধুনিক বিজ্ঞানের স্পর্শ ততদূর পৌঁছয়নি। খোলা ড্রেন দিয়ে নর্দমার জল যাচ্ছে, কিন্তু এ সবের বদল শীঘ্র হবে বলেই তাঁরা আশা করেন।

তাসকন্দ হোটেলে এলাম বিশ্রামের জন্য। সরকারী হোটেল বেশ বড়। আমরা এখান থেকে ছবির কার্ড কিনে চিঠি লিখলাম দেশে— দাম দেব কি করে, আমাদের কাছে আছে ভারতীয় মুদ্রা। আমাদের দোভাষী মহিলা কাকে কি বললেন— কার্ডও পেলাম, স্ট্যাম্পও পেলাম।

এই হোটেলের সামনে রাস্তার অপর পারে জাতীয় থিয়েটার— সুসজ্জিত উদ্যান ; ফোয়ারা থেকে জল ছিটকে পড়ছে। কত লোক, কত জাতের, কত বিচিত্র পোশাক। তবে পোশাক মোটামুটি পাশ্চাত্ত্য— রুশীয় নয়। উজবেকীরা কিন্তু তাদের জাতীয় পোশাক পরে। মেয়েরা পর্দানশীন নয়, উজবেকী পোশাক পরে চলেছে পথে— ট্রামে বাসে। মধ্যযুগের বুরখা-ঢাকা মেয়ে চোখে পড়ল না।

আবার শহর ঘুরতে বের হলাম, অন্য গাড়ি এসেছে। প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের ছুটি হয়েছে। তাসকন্দ বিরাট শিল্পনগরী— বিশেষতঃ তূলার বা সূতার কাপড় বানাবার কারখানা অনেক ; বড় বড় বাড়ি উঠছে পথের ধারে, জীর্ণ-কুটীরবাসীদের জন্য নির্মিত হচ্ছে।

বিকালে ফিরে হেটেলে খাওয়া-দাওয়া হল— তাকে লাঞ্চ বলতে পার— ডিনারও বলতে পার। তাসকন্দ হোটেলের বিরাট ভোজনশালা ; মহিলারাই সেবিকা। কি ছোটাছুটি করছে রাশি রাশি খাবার নিয়ে। এখানকার রান্নাবান্না রুশীয় থেকে একটু পৃথক— পোলাও, শিককাবাব প্রভৃতি এখানে দেয়। কিন্তু আমরা এমন অবেলায় হাজির হয়েছি, যখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাদ্যবস্তু

নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বেকন চলে না, বেশির ভাগ মেষ-মাংসই। প্রচুর আঙুর টেবিলে দিয়েছে। অন্য টেবিলে দেখি, ভোজনবিলাসীর দল এক একটা বৃহৎ তরমুজ কিনে এনে ফালা ফালা করে কাটিয়ে তৃপ্তি করে খাচ্ছে। আমার সহযাত্রীরা কেউ তরমুজ খেলেন না বলে, আমিও আর চাইলাম না; তবে ফিরতি পথে খেয়েছিলাম। শীতকালে তরমুজ খাওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারিনে, তাই স্বাদটা গ্রহণ করা গেল।

এরপর আমরা এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁতে চলে এলাম। তখন খাওয়ার ঘর একেবারে জনশূন্য, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কেবল দুইজন মহিলা সেবিকা অপেক্ষা করছেন। সাধারণতঃ এখানে যাত্রীর ভিড় হয় এরোপ্লেন এসে গেলে।

দ্বিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাসকন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী অধ্যাপক, ডক্টর তেওয়ারী, ইনি দ্বিবেদীর ছাত্র। বাসা পাননি বলে এখনও তাসকন্দ হোটেলে আছেন সপরিবারে। আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সন্ধান করি— তখন ছিলেন না। এখন এলেন। বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ জন ছাত্র হিন্দী শিখছে। উজবেকী ছাত্রই বেশি, রুশীও আছে। প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনটা ভাষা শিখতে হয় · মাতৃভাষা, রুশভাষা ও আরেকটা ভাষা— এখানে হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্সী ও চীনা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাঙলার ব্যবস্থা নেই; মনে হল, যেখানে শিল্পীরা নৌকা-ডুবির নাট্যরূপ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছে— তাদের মধ্যে বাঙলা শেখাবার ব্যবস্থা করলে হয়ত প্রয়াস ব্যর্থ হত না।

ডক্টর তেওয়ারী বললেন, তাসকন্দে সাধারণের মধ্যে হিন্দী ফিল্মের খুব জনপ্রিয়তা। 'বৈজুবাওরা' থেকে 'লাভ ইন সিমলা' সবই এসেছে। খুবই ভিড় হয়। এমন কি টিকিট বেচাবেচিও

চলে চড়া দামে। প্রথম প্রথম হিন্দী ফিল্মগুলিতে উজবেকী ভাষা জুড়ে দেওয়া (dub) হত, এখন তা হয় না। হিন্দী গান মুখে মুখে অনেকে শিখেছে, ছাত্রেরা কালিদাস, তুলসীদাসের সঙ্গে নার্গিস রাজ-কাপুর সম্বন্ধে জানবার জন্য উৎসুক। বুঝলাম, হিন্দী ভাষাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। আর জনতার রুচি? যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। মানুষের মত অনুকরণপ্রিয় জন্তুর জুড়ি মেলে না জীবজগতে।

মস্কো যাবার প্লেন এসেছে শুনলাম। মিঃ আনবার এসেছেন উঠিয়ে দেবার জন্য। সমস্ত যাত্রী দাঁড়িয়ে ঘেরার বাইরে— এখনও উঠবার হুকুম হয়নি। আমাদের দোভাষী গেটে কি বললেন, জানিনে— আমরা প্রবেশ করতে পেলাম। বিরাট জেট প্লেন দাঁড়িয়ে, আমরা প্রথমে উঠতে পাই— তারপর যাত্রীরা উঠলেন, ভরে গেল ৮০টা সীট।

৬

৯ অক্টোবর ১৯৬২

প্লেন উড়বার আগে টারম্যাকের উপর বহুদূর গড়গড়িয়ে চলল। তারপর ছুটতে ছুটতে কখন যে মাটি ছেড়ে উঠে গেছে— বুঝতে পারলাম না। সন্ধ্যার পর চারিদিকে আলো জ্বলছে, নীচের দিকে চেয়ে দেখে বুঝলাম, উড়েছি। জেট প্লেনের পেটের ভিতর কি শব্দ! অন্ধকারের মধ্যে কি করে চলছে ভাবি— শুধু কলের দিকে চেয়ে হেডফোন-এ চলার ইঙ্গিত পেয়ে চলেছে। রাতে প্লেন চড়ার আমার প্রথম এই অভিজ্ঞতা।

রাত্রের ডিনার এসে গেল। দ্বিবেদী বাছাবাছি করে খাচ্ছেন— পাছে ঘাসপাতা ও গব্যপদার্থের সঙ্গে অখাদ্য কিছু চলে যায়। আমরা 'মাফলেষু'র দল অর্থাৎ শুধু ফলে তুষ্ট নই। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা রুশ ভাষার বই নিয়ে নাড়ানাড়ি করছি। আমার বাথরুমের দরকার হলে একটি ভদ্র রুশীয় যুবককে রুশীয় শব্দটা বই থেকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন, কি ভাবে খোলা যায় দেখিয়ে দিলেন— তারপর ঠিকভাবে এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। প্লেন বেশ দুলছে। তাঁকে কাছে ডেকে কিছুক্ষণ ভাষা চর্চা করা গেল। আমি রুশ জানি না, তিনি ইংরেজি জানেন না। যুবকটি আসলে হাঙ্গেরিয়ান, এখন রুশীয় হয়ে গেছেন। বেশ ভাল লাগল— ভাষার ব্যবধানেও মানুষকে ভালবাসা যায়। তাঁকে ভুলিনি।

মস্কো দেখা যাচ্ছে কি? আলোকমালা-সজ্জিত বিচ্ছিন্ন শহর, সে সব শহরের নাম জানি না। কারা রাস্তায় আলো জ্বেলে

চলছে— কাদের ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে মোটরে করে কোথায় যাচ্ছে সব। প্রত্যেক ঘরে মানুষ আছে, কেমন তারা!

রাত ৯টার পর মস্কো এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। আজই সকালে নয়াদিল্লী ছেড়েছি। ভাবতেই পারছিনে, এই দূরত্ব কত অল্প সময়ে পেরিয়ে এলাম। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে সুন্দর ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উতরিল বলে পড়েছি। আজ যন্ত্রদানবের পিঠে চড়ে আমরা ছয় মাসের পথ ছয় ঘণ্টায় পার হয়ে এলাম। বিজ্ঞান স্থান-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মনে হল বিজ্ঞান কি মানুষে-মানুষে দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান দূর করতে পারছে? সে ব্যবধান তো বেড়েই চলেছে! ভাবা গিয়েছিল ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেবে— হলো না। ভাবা গেল বিজ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের মনকে সংস্কার মুক্ত করে সুন্দর করবে— হলো না। ভাবা গিয়েছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয় দূর হলেই দুনিয়াটা বেহেস্তে পরিণত হবে— তা-ও হলো না! মিলনের ভাষা কোথায়— কে জানে?

মস্কোতে যখন এরোপ্লেন থেকে নামলাম, তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, দুরন্ত হাওয়া বইছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে শীতের দেশে এসেছি। প্লেন থেকে নেমে দেখি সায়েন্স অ্যাকাডেমি থেকে গাড়ি এসেছে ও দুইজন প্রতিনিধি এসেছেন আমাদের স্বাগত করবার জন্য। তাঁদের একজন মহিলা। ইনিই পরে হলেন আমাদের দোভাষী ও অন্যতম গাইড।

এয়ারপোর্ট থেকে চলতে চলতে আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হল। কথাবার্তায় বুঝলাম, আমাদের বিশেষ কোন কাজের জন্য আনা হয়নি, কোন সভাসমিতিতে ভাষণাদির কথা শুনলাম না। দ্বিবেদী বললেন, তাঁর ইচ্ছা মস্কো য়ুনিভার্সিটিতে গবেষণার কাজ কি ভাবে চলছে সেটা জানবার। আমি বললাম,

দেশটা দেখব আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সোভিয়েত সাহিত্যিকরা কি কাজ করছেন, সেটা জানতে পারলে খুশি হব। আর যদি ব্যবস্থা হয় তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। পরে বুঝলাম আমাদের কথা শোনবার থেকে তাদের কথা শোনানোর জন্যই উৎসাহ বেশি। অসময়ের ঘুম থেকে ঝাঁকানি খেয়ে উঠে ঘুমন্ত মানুষটা প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায়, সে জেগে ছিল। নূতন জেগে সোভিয়েতদের সেই দশা। তারা কিছুতেই পেছিয়ে নেই— তারা সব বিষয়ে সবার থেকে এগিয়ে আছে, এটাই দুনিয়ায় জানান দিচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে। তাদের মাপকাঠিতে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের আদর্শে যাদের আস্থা পুরোপুরি মজবুত হয়নি, সেই সব 'অনগ্রসর' জাতের লোকদের ডেকে এনে দেখিয়ে দেয়, শুনিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়— তারা কী প্রাগসরী জাত হয়ে উঠেছে!

উক্রেইন হোটেলে উঠলাম। শুনলাম প্রায় ত্রিশতলা বাড়ি। প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে বসলাম। আমাদের দোভাষী মহিলা লিডিয়া দেবী ছুটোছুটি করছেন ব্যবস্থার জন্যে। বেশ ভীড়। নিয়ম অনুসারে পাসপোর্ট হোটেলে জমা দেওয়া হল। এটা করার কারণ কে কখন কোথায় যান, তার খবর রাখা সরকারপক্ষীয় লোকদের পক্ষে একান্ত দরকার। পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশীর কোথাও নড়বার উপায় নেই। ভুল করে লেনিনগ্রাদে যাবার সময় হোটেল থেকে পাসপোর্টগুলি নিয়ে যাওয়া হয়নি। লেনিনগ্রাদের হোটেলে সেটা দাখিল করতে না পারায় একটু মুশকিল হয়েছিল। সেই রাতেই টেলিগ্রাম করে, তার পরদিন প্লেনে পাসপোর্ট আনানো হয়। লেনিনগ্রাদের দোভাষী বারানিকফ পার্টির সদস্য— তিনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন— তা না হলে মুশকিলে পড়তে হতো।

উক্রেইন হোটেলে ঘর পাওয়া গেল আট তলায়— তবে পাশাপাশি ঘর হল না— তিন জনের তিন জায়গায় থাকতে হল ; আমার ঘরের নম্বর ৮৬২, কৃপালানীর ৮২৭ ও দ্বিবেদীর ৮১৪। শুতে প্রায় রাত একটা হয়ে গেল। কফি ছাড়া আর কিছু খেলাম না। ঘরে বিছানা পাতা, সেণ্ট্রাল হীটিং-এর ব্যবস্থা, জানলায় কাঁচের ডবল প্যানেলিং, পর্দা টাঙানো। মেঝে কাঠের, কার্পেট পাতা। বাথরুম পাশেই— বেশ বড় ঘর, বড় বাথটব ; গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, শাওয়ার স্প্রের ব্যবস্থা।

বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কানের কাছে রেডিও মৃদুকণ্ঠে বিদেশী ভাষায় গান করছে— কী তার আবেদন তা বুঝছিনে। তবে মনে হচ্ছিল মানুষকে যন্ত্রণা দেবার যে সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, এটা তার অন্যতম। কলকাতার বাসায় নিজেদের রেডিও খোলবার প্রয়োজনই হয় না— প্রতিবেশীর সর্বকাল-মুক্ত বাকযন্ত্র থেকে সদা আর্তনাদ ধ্বনি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখানে সেটি হচ্ছে না : মৃদু ধ্বনি— ইচ্ছা করলেই বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, সুইচ বিছানার কাছে। পাশেই বেড সুইচ, টিপলেই বাতি জ্বলে ওঠে।

৭

মস্কো

১০ অক্টোবর ১৯৬২

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলো ; ঘড়িতে দেখি ছয়টা বেজেছে। বাড়িতে অন্ধকার থাকতেই উঠি। এখানেও উঠে পড়লাম। সকালেই স্নান করে নিলাম— প্রচুর গরম জল। কিন্তু চায়ের জন্য মনটা ছুক ছুক করছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি একটা রেস্তঁরার মত রয়েছে, ঢুকে পড়লাম— চা খেলাম। দিল লেবু চা, আমার ভালোই লাগে— বাড়িতে মাঝে মাঝে শখ করে খাই। কিন্তু পয়সা দেব কি করে ? আমাদের কাছে তো ভারতীয় টাকা— রুবল বা কোপেক নেই। ভারতীয় নোট বের করে দেখালাম, বোধ হয় কর্মচারীরা বুঝলেন ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে লিডিয়া— দোভাষী মহিলা এসে পড়লেন। বেচারার বাড়ি অনেক দূরে। উক্রেইন হোটেলে গত রাত্রে প্রথম আসে অ্যাকাডেমির মোটরে করে। তার বাড়ি থেকে আসতে হলে বাস, মেট্রো অর্থাৎ পাতালযান ও পায়দলে আসতে হয়। এই দিকটাই তার জানা নেই ভালো করে।

লিফটে নীচে নামলাম, এখানকার লিফটে চালক আছে। অবশ্য তারা মেয়ে, কলকাতায় সক্ষম পুরুষদের এই হালকা কাজে নিযুক্ত করা হয় ; শক্তির অপচয়। তবে রাশিয়ার সব জায়গায় লিফটে লোক থাকে না। পরে লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরে এসে যে হোটেলে উঠি, সেখানে স্বয়ং-চালক হতে হয়। ফ্ল্যাট বাড়িতেও স্বয়ং-চালক ব্যবস্থা, অটোমেশন, র‍্যাশানালিজিশনের যুগ আগত !

নীচে সেই প্রতীক্ষালয়ে এলাম— যেখানে গতকাল রাত্রে এসে ঘরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দিনের আলোয় সবটা স্পষ্ট

হল, দোকান আছে অনেক কয়টা। আমাদের খাবার রেস্তঁরা হোটেল বাড়ির সংলগ্ন। কিন্তু একবার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আর একদিকে নামতে হয় সিঁড়ি বেয়ে, তারপর পাওয়া যায় খাবার ঘর। শুনলাম হোটেলের থাকা ও খাওয়া দুটো পৃথক প্রতিষ্ঠান। হোটেলে খাওয়ার ঘরে ঢোকবার আগে ওভারকোট রেখে যেতে হয় একটা দপ্তরে— চাকতি দেয় সনাক্তের জন্য। ওভারকোট পরে সার্কাস, সিনেমা ছাড়া আর কোথাও যাওয়া যায় না। ঘরের ও বাইরের তাপের তফাৎ বলে এটা হয়েছে।

আমাদের জন্য একটা টেবিল ঠিক করে রাখা ছিল। প্রাতরাশ শেষ করতে দশটা বাজল। এবার সফর শুরু হবে। ইতিমধ্যে আমাদের দ্বিতীয় দোভাষী বোরিস কারপুসকিন এসে পড়েছেন। আমরা অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অতিথি। সুতরাং সেখানেই প্রথমে যেতে হল। অ্যাকাডেমির-বড় বাড়ি— বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা থাম— আগের যুগের স্থাপত্য, প্রাঙ্গণে গোর্কির মূর্তি। একটু একটু তুষার পড়েছে, সমস্ত ভিজে ভিজে। অ্যাকাডেমি বাড়ির ঘরগুলি খুপরি খুপরি, বড় বড় ঘর দ্বিখণ্ড, ত্রিখণ্ড করা হয়েছে। আমরা একটা ঘরে বসলাম— সহকারী অধ্যক্ষ Akromovitch স্বাগত করলেন। অধ্যক্ষ চেলিসফ ছুটিতে আছেন— গেছেন কৃষ্ণসাগর তীরে বিশ্রামের জন্য— এঁর কথা পূর্বে বলেছি। সহকারী অ্যাকরোমোবিচকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে: বুদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল চেহারা। দোভাষী লিডিয়া তাঁর কথাগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করে বলছিলেন। এই অ্যাকাডেমিতে এশিয়ার প্রাচ্য ভাষার চর্চা হয়। এ বিষয়ে রুশীয়রা বহুকাল কাজ করছেন। তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষা নিয়ে আলোচনায় রুশ পণ্ডিতদের নামযশ আছে। সংস্কৃত ও পালির

চর্চার জন্য খ্যাতিমান স্কলারের নাম অজ্ঞাত নয় বিদ্বজ্জন সমাজে। এখানে বিদ্যার্থীরা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হন— পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কাজ বলা যেতে পারে। আগে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল লেনিনগ্রাদে — এখনো সেখানে আছে— তবে দুই জায়গার গবেষণার বিষয়ের পার্থক্য হয়ে গেছে। লেনিনগ্রাদে নানা দেশের, নানা ভাষার পুরাতন পুঁথিপত্র যথেষ্ট থাকায় সেখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষা (Philologia) ইতিহাস প্রভৃতির চর্চাটার উপর জোর পড়েছে।

মস্কোতে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজটাই জোর পেয়েছে। মস্কো রাজধানী, তাই রাজনৈতিক কারণ থেকেই দুনিয়াকে জানবার ও বুঝবার জন্য দেশবিদেশের ভাষাটাকে ভালো করে আয়ত্তে আনার আয়োজন হয়েছে রাজকীয়ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা পেয়ে অ্যাকাডেমিতে আসতে পারা যায়; তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় সুপারিশ চাই এখানে প্রবেশ করতে। তিন বৎসর কাজ করার পর বিদ্যার্থীকে থীসিস-এর চুম্বক ছাপিয়ে পেশ করতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা সেই চুম্বকটা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানের অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দেন। তবে অ্যাকাডেমির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধ না থাকলেও গবেষণার বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন বা কৌতূহলী, তাঁদের আহ্বান করা হয়। পরীক্ষা বেশ কড়াভাবেই হয়; মৌখিক প্রশ্নাদির সামাল দিতে হয়।

কথাবার্তার শেষে আমরা গ্রন্থাগার দেখলাম। প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সুন্দর সংগ্রহ। দৈনিক বাঙলা কাগজ, হিন্দী, উর্দু, মালয়ালম পত্রিকা বাণ্ডিল বাঁধা তাকে তাকে সাজানো।

অ্যাকাডেমির লাইব্রেরীতে তিব্বতী-রুশী অভিধান তৈরি হচ্ছে; রুশী-হিন্দী, হিন্দী-রুশী অভিধান এখান থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

বাঙলা-রুশী অভিধান হচ্ছে, অনেকেই বাঙলা নিয়ে কাজ করছেন— মিসেস বিকোবা (Bykova) তাঁদের অন্যতম। এঁর সঙ্গে পালাম বন্দরে দেখা হয়েছিল সে-কথা পূর্বে বলেছি। বোরিস কারপুসকিন বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উপর বই লিখেছেন; এখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' অনুবাদ করছেন। লুডমিলা চিককিনা নামে মেয়েটি বাঙলা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন। মিসেস বিকোবার কাজ এই অ্যাকাডেমিতে ভাষা নিয়ে। এঁরা সকলে মিলে বাঙলা ভাষার সুবৃহৎ ব্যাকরণ লিখছেন রুশীভাষায়। বলা বাহুল্য য়ুরোপীয় অন্য জাতও ভারতীয় ভাষা নিয়ে এককালে কাজ করেছেন। বাঙলা ভাষা নিয়ে পোর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বই লেখেন। ইংরেজরাও করেছেন— অ্যাণ্ডারসন ও মিল্‌নের কথা স্মরণীয়। খ্রীষ্টানি জগৎ অর্থাৎ য়ুরোপ-আমেরিকার নানা চার্চের নানা মতবিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা দুনিয়ার নানা দেশে গিয়েছেন, নানা ভাষা শিখেছেন, নানা ভাষায় বাইবেল ও খ্রীষ্টানি বই তর্জমা করেছেন— 'হীদেন'দের খ্রীষ্টান করবার উদ্দেশে। সোভিয়েত রুশ ঠিক সেই কাজই করছে সঙ্ঘবদ্ধভাবে একমুখী হয়ে— উদ্দেশ্য অনগ্রসর লোকদের সম্বন্ধে তথ্য জানা ও তাদের কাছে সোভিয়েতের বাণী প্রচার। ইতিপূর্বে এদের মত আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ও বিস্তারিত সংশ্লেষণী আলোচনা করতে আর বড় কাউকে দেখা যায়নি।

হোটেলে ফিরলাম অ্যাকাডেমি থেকে। আজ সকালের এটাই হল সবথেকে বড় কাজের কাজ— যাঁদের আমন্ত্রণে এসেছি তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত করা। লাঞ্চ করে হোটেল-এর একটা অফিস থেকে ২৫ টাকা ভাঙিয়ে নিলাম— পেলাম ৪ রুবল ২৮ কোপেক— অর্থাৎ এক রুবলের মূল্য পাঁচ টাকার বেশি, তবে ঐ টাকার বিনিময়ে ডলার বেশি পেতাম। তাই আমাদের কাছে টাকার বিনিময়ে

রুশীয় বা মার্কিনী জিনিষের মূল্য এত বেশি লাগে। সোভিয়েত দেশে রুবল দিয়ে লোকে দাম পায়— মার্কিনী মুলুকে ডলার দিয়ে। মার্কিনী যে জিনিষের দাম পাঁচ ডলার, আমাদের তার জন্য দিতে হবে পঁচিশ টাকা। কাজের জন্য যারা পায় ডলার বা রুবল তাদের কাছে জিনিষের দাম চড়া মনে হয় না, কারণ তারা চড়া দাম পায় কাজের বিনিময়ে। তাদের আয়ের অনুপাতে দ্রব্যের দাম ঠিক আছে, আমাদের মুদ্রার মানে সে-সব জিনিষের নাগাল ধরা যায় না ; তাই বলি ভয়ানক মহার্ঘ। কিন্তু দশ মিনিটের রেডিও ভাষণ দিয়ে যখন প্রায় সতের রুবল (একশ' টাকার উপর) পেলাম, তখন তার থেকে তের রুবল দিয়ে ক্যামেরা কিনতে গায়ে লাগল না। কিন্তু আমাদের টাকার হিসাবে দিতে গেলে লাগত প্রায় ৭০ টাকা। সুতরাং জিনিষের দাম মহার্ঘ বা সুলভ তা নির্ভর করে শ্রমবিনিময়ে লোকে যে টাকা পায় তার উপর। রুশীয় টাকা দিয়ে মস্কোর ম্যাপ, কিছু পুরাতন স্ট্যাম্প, দু'-একখানা বই কিনলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর লিডিয়ার সঙ্গে বের হলাম Tolstoi-এর বাড়ি দেখবার জন্য। তোলস্তয় থাকতেন তাঁর জমিদারী Yasna-polyana-তে। ১৮৮১ সালে মস্কো আসেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য। একটা বাড়ি কিনে প্রয়োজনমত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই বাড়িতে তোলস্তয় ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। সোভিয়েত সরকার এই বাড়ি রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে এনে যেমনটি ছিল তেমনটি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা পৌঁছলাম যখন, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়িতে (অফিস-ঘর-ছাড়া) বিজলী বাতি নেই, কারণ তোলস্তয়ের সময় বিজলী বাতি এ বাড়িতে ছিল না— তিনি পছন্দ করতেন না বলেই মনে হয়। তোলস্তয়ের নানা খেয়ালের চিহ্ন রয়েছে। তিনি যে ডাম্বেল নিয়ে রোজ

ব্যায়াম করতেন, সেটা রয়েছে। মাঝে মাঝে শখ হত বোধ হয়, গৃহিণীর সঙ্গে কলহ করে নিজে রেঁধে খাবেন, একটা স্পিরিট স্টোভ রয়েছে। স্বাবলম্বী হতে হবে তাই জুতো তৈরি করলেন; সেই জুতোজোড়া ও মুচির যন্ত্রপাতি—সবই রয়েছে। নিজে জল আনতেন বাইরের এক সোঁতা থেকে! বাড়ির যে-ঘরে তাঁর আদরের মেয়ে ছিলেন—যিনি অল্প বয়সে মারা যান—সে-ঘরটিকে ঠিক আগের মতই রাখা আছে। এক পৌত্র মারা যায়, তার সবকিছু সাজানো রয়েছে। গৃহিণী যে-ঘরে থাকতেন, সে-ঘরের বিছানার সবকিছু তাঁর নিজের হাতের করা। এই বাড়িতে তোলস্তয় তাঁর উপন্যাস Resurrection লিখেছিলেন, সেই টেবিলটা দেখলাম। টেবিলের পায়া কেটে খাড়াই কম করা হয়েছিল, কারণ যাতে লেখাপড়ার সরঞ্জাম চোখের খুব কাছে আসে। তিনি চোখে কম দেখতেন, কিন্তু চশমা' ব্যবহার করতেন না, সেটা কৃত্রিম চক্ষু! আমরা অনেকক্ষণ ঘুরলাম, অন্ধকার হয়ে এল।

এ বাড়িতে জুতোশুদ্ধ ঢুকতে দেয় না। শীতের দেশে তো শুধু মোজা পায়ে হাঁটা যায় না, তাই জুতোর উপর কাপড়ের জুতো পরে ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। মনে পড়ল দিল্লীতে আগ্রায় মসজিদে ও মকবরায় কাপড়ের জুতো পরে ঢুকতে হয়েছে। মস্কো লেলিনগ্রাদে অনেক জায়গায় এমনি ডবল জুতো পায়ে দিতে হয়েছিল।

তোলস্তয়ের বাড়ির চারিপাশটায় এখনো গাছপালা আছে—শহরের ভিতর হলেও গ্রাম্য আবহাওয়া রয়েছে পরিবেশের মধ্যে। তবে বাগানটায় খুব যত্ন করা হয় বলে মনে হল না; বরং উপেক্ষিতই লাগল। তোলস্তয় মস্কোতে থাকলেও য়াসনা-পালিয়ানাতে যেতেন, অন্যান্য জমিদারী তদারকেও বের হতেন।

এই বাড়ি ছাড়া তোলস্তয়-ম্যুজিয়াম আছে। সেখানে আছে তাঁর পাণ্ডুলিপি, ছবি, বই, তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থরাজি। এখানে নাকি তোলস্তয়ের হাতে-লেখা ১ লক্ষ ৬০ হাজার কাগজপত্র আছে, চিঠি আছে প্রায় ১০ হাজার। একটা রচনা লিখে তিনি কখনও খুশি হতেন না; কতবার যে কাটাকুটি করতেন তার ঠিক নেই। সেই সব কাটাকুটি ছাঁটাছাঁটি করা কাগজ আছে কয়েক হাজার। বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবিও আছে অনেক। সোভিয়েত সরকার ১৯৩৯ সাল থেকে তোলস্তয় সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য এই বাড়িতে ব্যবস্থা করেন; তার আগে তোলস্তয়ের আত্মীয় ও বন্ধুরা এই প্রতিষ্ঠানটির তদারক করেন।

তোলস্তয়ের বাড়ি দেখার পর আমরা চেকভ ম্যুজিয়ামে চললাম। আজ চেকভ লেখকরূপে পৃথিবীর সভ্যদেশে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁকে একদিন সংগ্রাম করেই এই নগরীর একটি ছোট বাড়ির এক অংশে থাকতে হয় দীর্ঘকাল। ১৮৭৯ সালে চেকভ মস্কোতে এসে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম চলে, পত্রিকায় গল্প লিখে কিছু উপার্জন করতে বাধ্য হন। সাত বৎসরে চারশ'র উপর রচনা-গল্প থেকে আদালতের মামলার রিপোর্ট পর্যন্ত লিখতে হয় অর্থের জন্য। গল্পের মধ্যে একটির নাম Sputnik, আজ যে নাম ঘরে ঘরে পরিচিত— অন্য অর্থে অবশ্য।

আমরা যে বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে চেকভ তাঁর নাটক Ivanov লিখেছিলেন। সেই টেবিল এখনো আছে। যাঁরা Korsli-এর থিয়েটারে অভিনয়ে নামেন, তাঁদের ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা আছে, অভিনয় সম্বন্ধে মতামতও। Ivanov অভিনীত হয় ১৮৮৭ সালে, বই আকারে প্রকাশিত হয় দু' বৎসর পরে। চেকভের প্রথম গল্প 'Strekoza' Dragon Fly নামে

হাসির কাগজে বের হয় ১৮৮০ সালে। সেই কপি রাখা আছে এই ম্যুজিয়মে।

চেকভ সাইবেরিয়া ভ্রমণে যান, সে সম্বন্ধে ছবি আছে টাঙানো। শাখালিন দ্বীপের ছবি রয়েছে— সেখানকার কয়েদীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং ফিরবার সময় সিঙাপুর, ভারত ও সিংহল হয়ে সুয়েজখাল দিয়ে দেশে ফেরেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর কোন মতামত সমসাময়িক কাগজপত্রে আছে কি না জানি না। রুশ-ভাষাভিজ্ঞ কেউ যদি চেকভের কাগজপত্রগুলি উল্টে-পাল্টে দেখেন তো ভাল হয়। ১৮৯২-এ চেকভ মস্কো ত্যাগ ক'রে সেরপুকোভ জেলায় মেলিখোবো (Melikhovo) গ্রামে জমিজমা কিনে বাস করতে যান। জায়গাটি ওকা নদীর ধারে মস্কো থেকে মাইল পঞ্চাশের মধ্যে। এই ওকা নদীর উপর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম য়াসনা-পোলিয়ানা যাবার সময়ে— বেশ বড় নদী, ভল্গায় গিয়ে পড়েছে। আমরা যে সময়ে ম্যুজিয়মে গিয়েছিলাম, তখন চেকভ-সপ্তাহ চলছে বলে স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দলে দলে আসছে। শিক্ষিকা সঙ্গে আছেন। স্থানীয় গাইড তাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন— ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বভাবকুতূহলী মন নিয়ে নোট নিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি দিচ্ছে। সত্তর বৎসর পূর্বে চেকভ ১৮৯২ সালে মস্কো ছেড়ে গ্রামে যান— সেইটা কি এই বৎসর ১৯৬২-তে স্মরণ করা হচ্ছে?

সন্ধ্যায় ফিরেছি হোটেলে; খুব ক্লান্ত— শুয়ে আছি ঘরে। শ্রীদাস নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে খাবার ঘরে; তিনি এলেন দেখা করতে। ইনি Indian Statistical Institute-এ কাজ করেন, ছুটি নিয়ে বিদেশে একটা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন সপরিবারে। স্ত্রী বিদেশিনী; একটি কন্যা, বৎসর ছয়-

সাত, কোলে একটি শিশু, তাকে পেরাম্বুলেটরে নিয়ে ঘুরছেন। পরিচয় হলে জানলাম, বাড়ি তাঁর বরিশালের গৈলা— এককালে নামজাদা বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের বাসভূমি বলে সারা বাঙলা দেশে খ্যাতি ছিল। I. S. I-র গিরিধি শাখায় শ্রীদাস কাজ করেন তিন বৎসর। গবেষণার বিষয় ছিল মাছের পোনা চাষে নাইট্রো-কোবাল্ট দিলে মাছের আকার বাড়ে। এ ছাড়া ছাগল বা গরুর পাকস্থলীর রস খাদ্য হিসাবে দিলেও নাকি মাছ বড় হয়। আমি শুধালাম, এ পদ্ধতি নিয়ে কি কেউ কাজ করেছে? তিনি বললেন, না, কেউ করেনি। আমি শুনে ভাবলাম, এমন গবেষণা, যার ফল কেউ গ্রহণ করল না! না করার কারণটা কি তা কি কেউ তদন্ত করেছে? এ শুধু এই পরীক্ষা নিয়ে নয়— অসংখ্য পরীক্ষার কি এই পরিণাম হয়নি? তিনি বললেন, ফরমোসা দ্বীপে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ফল পাওয়া গেছে, জানি না সেটা তাঁর শোনা কথা কিনা। Light hearted bureaucracy বলে একটা কথা শোনা যায়— এসব কি তারই নমুনা? শ্রীদাস বললেন, দেশে এই কাজে কোন উৎসাহ না পেয়ে এখন অন্য কাজ ধরেছেন। এটা চিকিৎসা-বিষয়ক। হাসপাতালে স্থান পাবার জন্য কোন ব্যারামের রোগীর সংখ্যা অধিক ও চাহিদা বেশি, সাধারণত কোন শ্রেণীর রোগী কতদিন হাসপাতালে থাকে, চাহিদার কতদিন পরে তারা স্থান পায় ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করছেন। এ তথ্যরাশি পেয়ে কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়া যাবে জানতে চাইলে শ্রীদাস বললেন, হাসপাতালের কি রকম বা কত রকমের চাহিদা হয়, তা জানতে পারলে তার ব্যবস্থার কথা সরকার ভাবতে পারবেন। কাজটা হচ্ছে, আমেরিকার National Medical Institute-এর পক্ষ থেকে। শ্রীদাস মস্কো হাসপাতাল থেকে তথ্য পেয়েছেন—

এখান থেকে লেনিনগ্রাদে যাবেন। হিং টিং ছট্-এর আবিষ্কার? না আবোল-তাবোলের কবিতা? হাসপাতালের প্রয়োজন খুবই— সে-বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে না— কিন্তু রোগ যাতে না হয় তার পরিবেশ সৃষ্টি করাই বোধহয় এক নম্বর কাজ। সদাব্রত, ভিক্ষাদান, পুণ্যকর্ম নিশ্চিত— কিন্তু ভিক্ষুকের বৃত্তি যাতে লোকের না নিতে হয়— সেই রকম আর্থিক পরিবেশ গড়াটাই বোধহয় সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সোভিয়েত সহরে তো ভিখারী দেখলাম না, পথের পাশে অস্থিচর্মসার মানুষকে ধুঁকতে দেখলাম না। উলঙ্গ উন্মাদিনীকে অশ্লীল কথা চিৎকার করে বলতে বলতে যেতে দেখিনি।

রাতে ডিনারের জন্য নেমে গেলাম। নিজেদের টেবিলে বসে খাচ্ছি। অদূরে দেখি একটি টেবিলে দু'জন খাচ্ছেন; দেখে মনে হল তাঁরা বিদেশী— রুশীয় নন। আলাপ করে জানলাম তাঁরা হাংগেরিয়ান সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার, মস্কোর সরকারী মুখপত্র Izvestia-র সঙ্গে তাঁরা যুক্ত, কাগজের কাজে এসেছেন। আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শুনে বললেন যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথা জানেন; বালাতন ফুরাদে কবি যে শিশু-তরু পুঁতেছিলেন সে সম্বন্ধে দেখলাম ওয়াকিবহাল। এঁদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হত।

আর এক টেবিলে একটি বাঙালী যুবক ও রুশী যুবক খাচ্ছেন। বাঙালীটির সঙ্গে আলাপ করতেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। তাঁরা Tass সংবাদ সরবরাহ সংস্থানের প্রতিনিধি, দিল্লীতে থাকেন— কাজে এসেছেন মস্কোতে।

৮

মস্কো

২১ অক্টোবর ১৯৬২

ভোররাত্রে শরীরটা খারাপ হ'ল— বুঝলাম অর্শ। আমি কৃপালানীকে ফোন করলাম আসবার জন্য। তিনি সব শুনে তখনই অফিসে গেলেন। প্রত্যেক তলায় একজন করে মহিলা পালাক্রমে তদারক করবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন। তাঁকে বলাতে তিনি তখনই কৃপালানীর সঙ্গে ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তার নয় ডাক্তারনী— এলেন দশ মিনিটের মধ্যে ওষুধের ব্যাগ নিয়ে। দেখেশুনে একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন। নার্স এসে পেটে ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাক্তারনী বললেন, তিনি স্পেশালিস্টকে খবর দেবেন। ইতিমধ্যে কৃপালানী ভুলুকে (শুভময় ঘোষ) ফোন করেছিলেন, সে এসে গেল, বিশ্বজিতও। এরা শান্তিনিকেতনের ছেলে— আমার অসুখ শুনেই চলে এসেছে। কারপুসকিন এসে বললেন— একটু পরে আমাকে একজন বড় ডাক্তারের কাছে clinic-এ পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগারোটার সময়ে অ্যাকাডেমির মোটর গাড়ি এল, আমরা সকলেই উঠলাম। কৃপালানী ও দ্বিবেদীজি যাবেন ভারতীয় দূতাবাসে। তাঁদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে কারপুসকিন ক্লিনিকে চললেন। এখানকার ক্লিনিকে ডাক্তাররা দেখেন বিনা পয়সায়— যেমন আমাদের দেশেও; ওষধপথ্য রোগীদের কিনতে হয়। আমি বারান্দায় কিছুক্ষণ বসলাম— কারণ তখন ডাক্তারের ঘরে আরেকজন রোগী ছিলেন। আমাকে যে ডাক্তার দেখলেন, তিনি বয়স্ক এবং পুরুষ মানুষ। ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, বিশেষ

কিছুই নয়— একটা ওষুধ লিখে দিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা হল— অবশ্য বোরিসের মারফং। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়েছেন, একটি প্রবন্ধও লিখেছেন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থের জন্য। আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি এবং খুবই যত্ন করে দেখেশুনে বললেন, বিশেষ কিছু নয়।

ক্লিনিক থেকে ফেরবার সময়ে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম। তখন রাজদূত আছেন শ্রীসুবিমল দত্ত। তিনি আমাকে নামে চেনেন। বর্ধমানে যখন তিনি সদরমহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, তখন তাঁর আদালতে যাই একটা মামলার সাক্ষী হয়ে। আমাদের পাড়ায় একটি ব্রাহ্মণ বাস করত এক ডোমনীকে নিয়ে। লোকটি সদ ব্রাহ্মণ বলে শহরের বিবাহ শ্রাদ্ধের বড় বড় ভোজে ভোজের রান্না করত। একদিন শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ি ফিরছি— দেখি পুলিস ক'জন তার বাড়িতে হানা দিয়েছে। প্রতিবেশীর কি হল জানবার জন্য গেলাম। স্থানীয় পুলিসের লোক আমায় চিনতেন, বললেন— 'একটা খানাতাল্লাসীর সাক্ষী হন'। ব্যাপার কি শুধালাম। তাঁরা বললেন, 'ইনি নোট ডবলিং করেন বলে অভিযোগ এসেছে, তাই এই খানাতল্লাসী।' কাঁচ, সিল্কের কাপড়— কি সব পেলেন মনে নেই। মোট কথা, সেই মামলার সাক্ষী দেবার জন্য বর্ধমান যাই। সুবিমল দত্তের এজলাসে মামলা হয়। মনে আছে তিনি বসবার জন্য চেয়ার দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বহুকাল পরে তাঁকে আজ দেখলাম— রাষ্ট্রদূতরূপে। বিশাল ঘরে একা বসে। শুনে এসেছি যে তিনি দু'দিন পরে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। কিছুকাল আগে তাঁর একমাত্র পুত্র মস্কোতে এই বাড়িতে মারা গেছে। সে এসেছিল বেড়াতে বাপের কাছে। দু'বছর আগে মিঃ দত্তর স্ত্রী মারা গেছেন— এবার গেল ছেলে। মন ভেঙ্গে গিয়েছে- কাজে আর

মন দিতে পারছেন না। ফিরে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারী হবার কথা হয়েছে। বহুকাল বৈদেশিক সচিবের কাজ করেছেন; আগের যুগের I. C. S-দের মধ্যে নামকরা লোক। মিঃ দত্ত ধূমপান করেন না, অন্য ব্যসন তো দূরের কথা। তবে দূতাবাসে রাখতে হয় সবই— তাও বললেন। ভারতীয় দূতাবাসের অপব্যয়ের কথা প্রবাদগত। স্বাধীন ভারত দেশে দেশে দূতাবাস খুলে প্রথম কয়েক বৎসর যেভাবে টাকা উড়িয়েছিল তার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আসলে যে ছেলেকে বাপ যৌবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নাবালক বানিয়ে হাতখরচটি হাতে দেন না, সে যখন বাপের মৃত্যুর পর কাঁচা পয়সা হাতে পায়, তখন যেমন দুই হাতে খয়রাতি করে কাপ্তানী দেখায়— আমাদের দেশের সরকারী টাকা নিয়ে তেমনি ছিনিমিনি খেলা চলেছিল এবং তাতে যে এখনও দাঁড়ি পড়েছে, তাও নয়। তবে বিদেশে স্টার্লিং ব্যালেন্স কমলেই শ্মশান-বৈরাগ্যের মত ব্যয়-সঙ্কোচের কথা মনে পড়ে। তারপরে গলায় গাবের বীচি নেমে গেলেই স্বর বদলে যায়— তখন বলে, 'গাব খাব না খাব কি, গাবের বাড়া আছে কি। বিলাত যাব না, করব কি— বিলাতির বাড়া আছে কি'— এই বুলি! নানা ছুতোয় লোক বিদেশে চলতে শুরু করে— স্টার্লিং-এর অভাব হয় না। স্ত্রী তো সঙ্গে যানই, অপোগণ্ড শিশুরাও বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গী হয়!

শুনেছি, নেপোলিয়ন মস্কো আক্রমণ করতে এলে ভারতীয় দূতাবাসের এক অংশে ১৮১২ সালে বাসা বেঁধেছিলেন, ভেবেছিলেন, রুশ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হবে। সেসব কথায় পরে আসতে হবে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চে স্যুপ ও আঙুর ছাড়া কিছু খেলাম না। দুপুরে কৃপালানীরা গেলেন লেখকদের সভায়— আমি গেলাম না, হোটেলেই থাকলাম। সন্ধ্যার পর পাপেট শো অর্থাৎ পুতুলনাচ

দেখতে চললাম। সঙ্গে বোরিস কারপুসকিন, লিডিয়া আজ এলেন না। থিয়েটারের মত ঘর— আমাদের টিকিট একই জায়গায় পাওয়া যায়নি ; তাই পৃথক পৃথক্ বসতে হল। আমি ও দ্বিবেদী দ্বিতীয় পংক্তিতে চেয়ার পেলাম— সুতরাং দেখতে কোন অসুবিধা হল না। পুতুল দিয়ে একটা অভিনয়। অভিনয়ের বিষয় হচ্ছে মার্কিনী সিনেমা তৈরির বিদ্রূপ। ডিরেক্টর, লেখক, পুঁজিপতি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজ নিজ স্বার্থ ও খেয়াল-খুশিমত কাজ করছে ; বিবিধ দৃশ্য আনতে হবে বলে ফরমাইশ— বৈচিত্র্য চাই ; তাই স্পেন দেশীয় ষাঁড়ের লড়াই— মাতাদোর পর্যন্ত এলেন। সিনেমার ফিল্ম তোলা হচ্ছে তাও পুতুল দিয়ে দেখানো হল ইত্যাদি। মোট কথা, হাসির ব্যাপার সবটা মিলে— উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ করা। কথা বলছে অবশ্য রুশ ভাষায়। কুকুর একটা লেজ নাড়ছে ও ঘেউ ঘেউ করছে, ষাঁড়টা তেড়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক আকার সবারই। অভিনয় শেষে যাঁরা পুতুল নাচাচ্ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ পুতুল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। একি ! এ যে সব doll, ছোট ছোট পুতুল সেলুলায়েডের। স্টেজের কায়দায় বাইরে থেকে দেখাচ্ছিল মস্ত।

রুশীয় পুতুলনাচ য়ুরোপের পরম্পরাগত পদ্ধতি থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। সার্জাই ওব্রাজৎসোব (Obraztsov) ডিরেকটর হয়ে নূতন টেকনিক আনেন। সমকালীন সমস্যাদি নিয়ে এঁরা ছবি সৃষ্টি করেন। এক একটা পুতুলে কত অদৃশ্য সুতো আছে জানিনে ; তবে পড়েছি ছয় থেকে ত্রিশটা পর্যন্ত সুতো লাগান থাকে পুতুলের দেহের নানা অংশে, যাতে ক'রে অতি সূক্ষ্ম নড়াচড়াও দেখানো যায়। আজকের পুতুলনাচে ও দোলনে কি সূক্ষ্ম ভাবভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে।

অ্যাকাডেমির গাড়ি ঠিক সময়ে এসেছিল। আমরা হোটেলে

ফিরলাম ঠিক সাড়ে নয়টায়। একটু স্যুপ, আইসক্রীম খেলাম। হোটেলে আজ নাচ জমেছে। কন্সার্ট বাজছে একটা মঞ্চের উপর — জন ছয় লোক নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে। যে লোকটা ড্রাম, করতাল, কাঠি একসঙ্গে বাজাচ্ছে তাকে দেখতে আমার খুব মজা লাগছিল। লোকটাও বেশ আত্মচেতন ছিল, তার বাজানোর কায়দায়। যেই নূতন একটা সুর বেজে ওঠে— অমনি নরনারীর দল খাওয়া ছেড়ে একটু নেচে আসে, আবার খেতে বসে। খাওয়ার সঙ্গে পানটাও চলে— তা ছাড়া ধূমপান। একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক একটি তরুণীকে পেয়েছেন, খুব নাচছেন তার সঙ্গে। উৎসাহটা তাঁর দিকেরই বেশি; কারণ 'কারণ-সলিলটা' একটু বেশি পরিমাণে উদরস্থ হয়েছে। মেয়েটি যদি আরেকটু উৎসাহ দেখাত তবে তিনি নাচ জমাতে পারতেন। সব খাদকই যে খাদ্য ছেড়ে উঠে নাচতে যান, তা নয়। আমাদের মত বেরসিকও আছে। পাশের টেবিলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা খাচ্ছেন ও পান করছেন— নাচের দিকে মন নেই; তবে মনে হয় মাঝে মাঝে নাচের দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটছেন। চেহারা ও বর্ণ দেখে মনে হল স্পেনীশ বা মেক্সিকান। আমরা ১১টার পর খাওয়ার ঘর ছাড়ি, তখনো খাওয়া চলছে। কন্সার্ট বন্ধ হয়েছে এগারোটায়। খাওয়ার সঙ্গে পানের পরিমাণটা দেখবার মত। শীতের দেশে প্রচুর খেতে হয় ও দেহকে তাজা রাখবার জন্য পানটা করতে হয় পেটভরে সেই অনুসারে। মাতালও দেখেছি, মাতলামি করতেও দেখেছি। ভডকা রুশীয়দের জাতীয় 'পানীয়'— সকলেই খায়, যেমন আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পচুই ও তাড়ি। হোটেলে নানা রাষ্ট্রের ভাল 'ওয়াইন' প্রচুর বিক্রী হয়; দেখতাম রোজই। তবে আমরা দু'জন ও রসে বঞ্চিত ছিলাম।

৯

মস্কো

১২ অক্টোবর ১৯৬২

ভোরে দ্বিবেদী তাঁর ঘর থেকে ফোনে খবর নিলেন। এই একটা মস্ত সুবিধা, ঘরে বসে ফোনের সাহায্যে কথা বলা যায়। ঘরে ঘরেই ফোন রয়েছে। স্নান করে নিলাম ; গতকাল স্নান করিনি। স্নানের পরই সারাদিনের জন্য তৈরি হই— অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ পরে প্রস্তুত। গতকালের আঙুর ছিল একরাশ ; তাই খেলাম। সাদা জল খুব দেয়। বোতলে ভরা মিনারেল ওয়াটার বা খনিজ জল আনা ছিল, টেবিলে বোতল খোলবার যন্ত্রও আছে। সেই জল খেলাম।

সকাল থেকে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমার আটতলার ঘর থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে : ট্রলিবাস, সাধারণ বাস চলছে ; ফুটপাথের ধারে এসে নির্দিষ্ট স্থানে থামছে। লোকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, আগে ওঠবার জন্য ঠেলাঠেলি নেই। কলকাতার বাস-ট্রামের ছবি মনে পড়ছে। এখানকার ফুটপাথ মানুষের পায়ে-চলার পথ— তথাকথিত উদ্বাস্তুদের দোকান বা চটবিছিয়ে মনোহারী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় না। থেকে থেকেই বস্তা চট-শুদ্ধ মালপত্র নিয়ে ছুট দেয়— পাশের দোকানে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে— পুলিশ আসছে! 'পুলিশ গেল ঘর— মালপত্র বের কর' রব করল। এই খেলা প্রায়ই দেখা যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জনস্রোত— দেখছি ছোট ছেলের হাত ধরে মায়েরা বের হয়েছেন, কোথায় যাচ্ছেন এমন দিনে জানি না ; বোধহয় স্কুলে মা পৌঁছে দিতে চলেছেন। তাদের স্কুলে রেখে হয়তো তাঁদের কাজে বের হতে হবে।

সমস্ত বয়স্থা মেয়েদের ও পুরুষদের অফিসে, স্কুলে অথবা কলে কারখানায় কাজ করতে হয়। সমস্ত জাতকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির নেশায় এরা মেতেছে। মা গেল কাজে, ছেলেমেয়ে গেল স্কুলে, বাপ গেল অফিসে বা কারখানায়। এরই মধ্যে সংসারের সব কাজ সারতে হয়। মনে হল এটাই কি সভ্যতার চরম রূপ? কে জানে। নরনারীর কি পৃথক জগৎ নেই?... একবার পুকুর কাটাচ্ছিলাম। বাঙালী কুলি পাওয়া যায় না শক্ত কাজের জন্য। ছোটনাগপুরের ওঁরাও কুলি এল একদল। সবাই পরিবার নিয়ে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী কাজ করে। মেয়েরা শিশুদের বেঁধে নেয় পিঠে; সেই অবস্থায় মাটি কাটে, ঝুড়ি বয়। আবার ঝুপড়িতে গিয়ে রান্না করে; বেরিয়ে এসে জল আনে, কাপড় কাচে— আবার মাটি বয়। নরনারী সমানভাবে খেটে চলেছে। শোনা যায়, পুরুষের একলা আয়ে চলে না— তাই তো 'ছোটলোক'দের মেয়ে-মরদে খাটতে হয়। আজ দুনিয়া-ভর মধ্যবিত্ত মেয়ে-মরদে খেটেও হিসাবের ডাইনে-বাঁয়ে মেলাতে পারছে না। পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রায় সর্বত্র মেয়ে-মরদে শুধু খাটছে না, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে চাকরির বাজারে। আর্থিক ও সাংসারিক সমস্যার সমাধান হয়েছে? সংসারে ও সমাজে, সুখশান্তি, শৃঙ্খলা বজায় আছে? এদের 'কাজ কাজ' বাতিক দেখে ভাবছি— একেই নাকি বলে সভ্যতা! আমরাও আজ সভ্য হতে চলেছি— মেয়ে-মরদে অফিসে, স্কুল-কলেজে কাজ করছি।

প্রাতরাশের পর বের হলাম। বোরিস এসেছেন,— অ্যাকাডেমিতে যেতে হবে। প্রথম দিন এসেই এখানে এসেছিলাম— আজ কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উপস্থিত হলাম। আমরা বসলাম Roerich-এর ঘরে। বই ঠাসা।

টেবিলে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষা নিয়ে কাজ করছেন কয়েকজন। এই ঘরে জর্জ রোএরিখ কাজ করতেন। ইনি ভারতে ছিলেন বহুকাল। চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোএরিখ ১৯২১ সালে দুটি ছেলেকে নিয়ে রুশ থেকে পালিয়ে লণ্ডনে যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিকোলাসের দেখা হয়। পরে নিকোলাস হিমালয়ে উমাস্বতী নামে একটি স্থানে এসে বাস করেন। জর্জ রোএরিখ ভাষাবিদ হয়ে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। তিব্বতী ভাষা থেকে কিম্বদন্তীমূলক Blue Annals নামে ইতিহাস ইংরেজিতে তর্জমা করে যশস্বী হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে এ বই এলে আমি পড়েছিলাম এবং আমার কয়েকটা প্রশ্ন ও সন্দেহের কথা জর্জকে লিখে জানাই, তিনি জবাবও দিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর আগে জর্জ সোভিয়েত দেশে ফিরে যান— যে দেশ তাঁর পিতা তাঁদের নিয়ে ত্যাগ করেছিলেন প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। এ যেন পলাতক পুত্রের (প্রডিগ্যাল সনি) পুনরাগমন : রোএরিখ মনেপ্রাণে পুনরায় 'রুশ' হয়েছিলেন। এই অ্যাকাডেমিতে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হন। গত বৎসর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুদিন-স্মরণে সভা হবে দুই-একদিনের মধ্যে— আমাদের আসবার জন্য বললেন।

আমরা রোএরিখের পড়বার ঘরে বসলাম। ঘরোয়া বৈঠকে— চেয়ার নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসে, কথাবার্তা চলল। স্কলাররা একে একে নিজ নিজ পরিচয় দিলেন— বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, উর্দু ভাষা নিয়ে কে কি কাজ করছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। মাদাম চেভকিনা বাঙলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন, মিস্টার ভ্যাসিলি বেসক্রোভনী উর্দু-রুশী অভিধান তৈরিতে লেগেছেন। ইনি লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ অধ্যাপক

বারানিকভের ছাত্র— হিন্দী ও উর্দু ভাষা নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত। মিঃ রাবিনোভিচ ভারতীয় অভিধান বা কোষগ্রন্থতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং বর্তমানে নেপালী-রুশী ভাষায় অভিধান সম্পাদনে ব্যাপৃত আছেন। মিঃ সিরকিন বৈদিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন, অধুনা ছান্দোগ্য-উপনিষদের অনুবাদ বের হয়েছে। তাঁর কৃত পঞ্চতন্ত্রের একটা নূতন তর্জমা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। মিঃ সেরেব্রিয়াকোভ ও মিঃ রাবিনোভিচ যৌথভাবে পঞ্জাবী-রুশী অভিধান প্রস্তুত করেছেন। সেরেব্রিয়াকোভ পঞ্জাবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখছেন। সংস্কৃত ইনি ভালই জানেন; ভর্তৃহরি নিয়ে গবেষণা চলছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতির রুশ অনুবাদ এঁরই করা: সে বই নাকি ২৫ হাজার ছাপান হয়; সমস্তই বিক্রি হয়ে গেছে। মিনায়েফ, শেরবাৎস্কি প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার আচার্যদের ছড়ান লেখাগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদন করেছেন ইনি। এ বইটা ইংরেজি তর্জমা হলে ভাল হয় বললাম।

বাঙলা ভাষা যে মেয়েটি পড়ে— চেভকিনার সঙ্গে কথাবার্তা হল। দেখলাম ভাষার উপর বেশ দখল আছে। সে অতি-আধুনিক কোন বাঙালী সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমার মতামত চাইলে, আমি বললাম,— 'আমি ১৯৪১ সালে থেমে আছি।' কথাটা বুঝতে না পারায় বললাম, 'আমি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চর্চা করি— তাঁর বাইরে আর কারও সম্বন্ধে বলবার অধিকার রাখি না।' বর্তমান ভারতের যে সকল কবি বা সাহিত্যিক বামপন্থী বলে আত্মঘোষণা করেন বা সমাজতন্ত্রবাদী এবং যাঁরা সেই মতের অনুকূলে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের কথা শোনবার জন্য এদের খুব আগ্রহ। স্বাভাবিক। এমন সব লেখকের নাম এঁরা জানেন, যাঁরা আমাদের কাছে অজানা। এইসব লেখকদের দুই-চারটে গরম গরম কবিতা

বা চরম দারিদ্র্যের কাতরানিপূর্ণ কাহিনী রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এগুলি ভাষান্তরিত হয়েছে, তাদের সাহিত্যিক গুণের জন্য নয়— তাদের বক্তব্যের জন্য, অর্থাৎ বিশেষ মতবাদের সমর্থনে এগুলি রচিত বলেই সমাদৃত হচ্ছে। বুঝলাম— সাহিত্যকে রসের দৃষ্টি থেকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না; মতবাদের অনুকূলে লিখিত বলেই তাদের মান দিয়ে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসন দেওয়া হচ্ছে। এসব দেখে-শুনে মনে হয়, এখনো এদের বিচারবুদ্ধিতে maturity বা পরিপক্কতা আসেনি। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এদের যে উৎকর্ষলাভ হয়েছে, আর্টের ক্ষেত্রে সে রকম শিখর-ছোঁয়া তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি এখনো দেখা যায়নি। নিজেদের মতের অনুকূলে বিজ্ঞানকেও যেমন আনা যায় না, সে তার নিজের ধর্মানুসারে চলবেই; তেমনি আর্ট ও সাহিত্যের নিজস্ব কথা আছে। সেটাকে বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করাই হচ্ছে আসল বিজ্ঞানী-বুদ্ধির পরিচায়ক। তবে নবীন রুশীয় লেখকরা স্তালিনের মধ্যযুগীয় inquisition-এর মনোভাব থেকে বের হয়ে আসছে।

কথাবার্তায় বুঝলাম, এখন পর্যন্ত রুশীয় স্কলাররা ভাষা-চর্চা ও অনুবাদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত। ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করে, বিদেশী ভাষার সাহিত্য নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে জনতার সামনে এঁরা ধরে দিতে চান। আজ পাশ্চাত্য দেশের যে কোন ভাষায় ভাল বই প্রকাশিত হলেই তা অল্পকালের মধ্যে প্রায় সব প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়। তাই নরওয়ের সঙ্গে গ্রীসের, স্পেনের সঙ্গে রুশের, আমেরিকার সঙ্গে পোলাণ্ডের ভাব বিনিময় অব্যাহত হয়ে আছে। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক osmosis ক্রিয়া চলছে নিরন্তর। ভারতে তার চেষ্টা সবেমাত্র শুরু হয়েছে সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে। সোভিয়েত রুশের যতগুলি

অঙ্গরাজ্য আছে তার প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞান পরিষদ আছে এবং প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পর্যাপ্ত আয়োজন হয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সাহিত্য অ্যাকাডেমি গঠিত হলে ভারত-ভাবনা সুদৃঢ় হত। এদের কাজকর্মের ব্যাপকতা, গভীরতা ও আন্তরিকতা দেখে বিস্মিত হলাম— কই, ভারতে সে-প্রচেষ্টা তো দানা বাঁধছে না— কেরালা-কাশ্মীরে, অন্ধ্র-আসামে ভাবসূত্রের ঐক্য কি খুঁজে পাওয়া যায়? মনে মনে বললাম, 'তোর উপরে নয় ভুবনের ভার।' এই মোলাকাত শেষ হলে আমাদের ফোটো নেওয়া হল। ভাল করে প্রিণ্ট করে আমাদের পরে পাঠিয়ে দেন।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হলাম মস্কোর বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটি দেখবার জন্য। লিডিয়া ফোন করে সব ঠিক করে রেখেছিলেন— তাই পৌঁছানো মাত্র গাইড এসে আমাদের স্বাগত করলেন। নতুন বাড়ি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৈরি হয়েছে— লেনিন পাহাড়ের উপর বহু দূর থেকে তার শিখর দেখা যাচ্ছে। পথ দিয়ে চলেছি, বন্ধুরা বললেন— ঐ দেখা যাচ্ছে mosfilm, সোভিয়েত দেশের বৃহত্তম সিনেমা তোলার কেন্দ্র, এটা ছোট মনে হচ্ছে— তাই নূতন একটা তৈরি শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছলাম। বিরাট অট্টালিকার সামনে গাড়ি থামল। মাঝের বাড়ি ৩২ তলা, উচ্চতা, ৭৮৭ ফুট, তার উপর শিখর। আশেপাশে প্রায় ৪০টি ইমারত; সমস্ত জমি প্রায় আড়াইশ' একর। কত রকমের গাছ দেশ-বিদেশ থেকে এনে যত্ন করে বড় করা হচ্ছে। ফুলের বাগানে বারো মাস ফুল পাওয়া যায় এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে।

প্রায় চল্লিশটা বাড়ি কাছাকাছি— একটা প্ল্যানের মধ্যে তৈরি; দোতলা, তিনতলা, ছয়তলা, নয়তলা, বারোতলা, আঠারোতলা

বাড়ি— মাঝের ঐ বত্রিশতলা বাড়ির আশেপাশে বিন্যস্ত। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লোমোনোসোভ-এর বিশালমূর্তি প্রাঙ্গণে দেখলাম। অষ্টাদশ শতকের লোক তিনি— আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে অমর নাম অর্জন করেছেন।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় বর্ণনা করা সম্ভব নয়— সেটা করতে গেলে সোভিয়েত রুশের শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা আনতে হয়। সেটা তো সম্ভব নয় এখানে। মোটামুটি গাইডের কাছ থেকে জানলাম যে, এখানে ১৪টি ফ্যাকালটি বা শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভাগ আছে— বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ। এই বাড়িতে বিজ্ঞানসম্পর্কীয় বিষয়গুলি ও পুরানো বাড়িতে হিউম্যানিটিজ বিষয়গুলি পড়ানো হয়। হিউম্যানিটিজ কথাটা আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে।—কারণ বারো বৎসর বয়সে 'সমাজ' বিষয়ক বিরাট বই তাকে পড়তে হয়!

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাড়িতে চার হাজারের মত ছাত্র আছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে দশ বৎসর পড়ে পাশ করলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার। তবে পাশ করলেই সেটা হয় না; বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আবার যাচাই করে নেয়। যেসব ছাত্র সত্য সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে থাকবে, তাদেরই ভর্তি হবার জন্য মনোনীত করা হয়। এই পরীক্ষায় সিকিভাগ ছেলে পাশ করে; অবশিষ্টরা কারিগরি, মিলিটারি প্রভৃতি নানা বিদ্যাকেন্দ্রে ভর্তি হতে পারে। উচ্চ বিজ্ঞান সকলের জন্য নয়, তার মানে এ নয় যে, দরজা বন্ধ; আদৌ তা নয়। যারা মেধাবী ছাত্র, তাদেরই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়— দারিদ্র্য কোন অন্তরায় নয়। আবার পয়সা থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জন সরকারী বৃত্তি পায়। ছাত্রদের হস্টেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন— পৌনে ছয় হাজার ঘর।

আমরা ছাত্রাবাসে গেলাম। একটি কুঠরীতে প্রবেশ করে বসলাম। খাট, টেবল, চেয়ার, বিছানা, আলো, হীটার, বাথ্—সবই আছে। ঘর ভাড়া লাগে সামান্য— খাওয়ার খরচ ৯০ রুবলের মধ্যে হয়ে যায়। বই ছাত্রদের কিনতে হয়, তবে লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্তকের বহু কপি থাকে এবং লাইব্রেরীও অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে— তাই ছাত্রদের হস্টেল থেকে এসে লাইব্রেরীতে বসে পড়তে অসুবিধা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর একটা অংশ দেখলাম-- সব দেখা তো সম্ভব নয়— ৩৩টা রীডিং রুম, একটাতে ঢুকেছিলাম। জানতে পারলাম গ্রন্থাগারে দশ লক্ষ বই। চৌদ্দটি বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বিশ হাজারের উপর--- প্রায় তিন কুড়ি দেশ থেকে ছাত্র এসেছে। শিক্ষকরা এখানে থাকেন— প্রায় দুশো ফ্ল্যাট আছে তাঁদের জন্য। সকল শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা সওয়া দুই হাজারের বেশি। অবশ্য এ বাড়িতে সব বিষয় পড়ানো হয় না তা পূর্বে বলেছি ; শহরের পুরানো বাড়িতে অনেকগুলো বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। সেখানে একটা সেমিনারে এক সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে ভাষণ দিতে হয়েছিল।

ছাত্রদের সভাগৃহ দেখলাম অতি পরিচ্ছন্ন। বুঝলাম, এখানে ইউনিয়ন নেই। তাই ঘরের দেওয়ালে, করিডরে, সিঁড়ির ধারে, খবরের কাগজের উপর কলমের ডগা দিয়ে লাল অথবা নীল কালিতে দলগত নির্বাচন 'সাফল্যমণ্ডিত' করবার জন্য 'অনুরোধ' নেই। পঁচিশটা পার্টির পঁচিশ জন ছাত্রনেতার জন্য সুপারিশ নেই। আমাদের স্কুল-কলেজের ঘরবাড়ির কথা মনে পড়ছিল— দারিদ্র্যই কি অপরিচ্ছন্নতার কারণ? না, চিত্তদৈন্য?···অনেকগুলি হল (Hall) দেখলাম। একটা ঘরে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়েছিল, বললেন গাইড। আমাদের প্রথমে যে বিরাট হলঘরে

নিয়ে যায়, সেখানে নেহরুকে সম্মান দেখানো হয়েছিল। সে ঘর সুন্দর, ঐশ্বর্যমণ্ডিত। দেড় হাজার কুশান দেওয়া চেয়ারে দর্শক-শ্রোতারা আরামে বসতে পারেন। ঘর যতদূর সম্ভব সুন্দর করা যায়, তার প্রচেষ্টা হয়েছে। সবার মধ্যে তাক লাগিয়ে দেবার ইচ্ছা খুব স্পষ্ট। যে যুবকটি আমাদের গাইডের কাজ করছিল, তার সঙ্গে অনেক কথা হল— হস্টেলের একটা ঘরে বসে। সে ভালো ইংরেজি বলতে পারে বলে সুবিধা হয়েছিল ; দোভাষীর প্রয়োজন সব সময় হচ্ছিল না। তার নাম Yuri— পুরোপুরি 'মস্কোভাইট' ; মস্কোর খাস বাসিন্দারা বেশ আত্মসচেতন। যুবকটি পূর্বে মিলিটারি বিভাগে কাজ করত, পরে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কাজ করে ছেড়ে দেয়। এখন রাতে জার্নালিজম পড়ে ও দিনমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইড-এর কাজ করে। বিবাহিত— স্ত্রীপুত্র নিয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে একজন সৈনিক বেশধারী লোক দেখে ফিরছিল। সে ককেশাসে কাজ করে ; এসেছে মস্কো দেখতে। বোরিস বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, একদিন ইনি হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসবেন। লোকটির সমস্ত দেখবার, জানবার আগ্রহ খুব। তা হলে পেশা বদলানো যায়!

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বত্রিশ তলার উপর লিফ্‌টে করে উঠলাম। হলঘরে বিজ্ঞানীদের আবক্ষমূর্তি। য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেই যে বিশাল হলে এসেছিলাম— সেখানে সর্বদেশের, সর্বকালের বহু জ্ঞান-তপস্বীর মূর্তি দেখে এসেছি। হলের দুইপ্রান্তে পাবলোভ ও মেণ্ডেলীফ্‌-এর বিরাট মূর্তি ; ঢকেই সামনে লোমনোসোভের মূর্তি। বত্রিশ তলায় উঠেও রুশীয় বিজ্ঞানীদের মূর্তি দেখলাম। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ— ম্যুজিয়ামও বটে। ম্যাপ, মডেল, গ্লোব, পাথর, শিলা সাজান। সে সব দেখবার সময় খুব কম। তবুও চোখ বুলিয়ে নিলাম।

বত্রিশ তলার সামনে যে খোলা বারান্দা, আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। সমস্ত মস্কো শহর এখান থেকে ছবির মত ফুটে উঠল। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া ও slit বা তুষারকণার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। মানুষের হাতের ছোঁয়া পেলে ধূসর মাটি সবুজ হয় আবার শ্যামল প্রান্তর মরুভূমি হয়। মানুষের হাতে জাদুমন্ত্র আছে। উপরের ছাদ থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েতের বিখ্যাত ক্রীড়াঙ্গন বা স্টেডিয়াম। য়ুরি দেখাল— ঐ দূরে— ঐখানে পায়োনিয়ার্স প্যালেস।

য়ুরি দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় নিল ; তার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি মনে আছে। আমাদের মোটর এসে গিয়েছিল ; উঠলাম সকলে। বোরিস মেট্রো দিয়ে চলে গেলেন। আমরা Stadium-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমি বললাম— এটা কি দেখা যায় না ? গাড়ির ড্রাইভারটি খুব চালাক ও বুদ্ধিমান। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে প্রহরীদের কি বলল জানি না— তখনি বিরাট লৌহ কপাটটি খুলে গেল, মোটর ঢুকে পড়ল আঙিনার মধ্যে। তারপর আমরা উঁচু উঁচু ধাপের সিঁড়ি বেয়ে স্টেডিয়ামের মঞ্চে উঠলাম। মঞ্চ পার হয়ে গ্যালারী-ঘেরা বিরাট ক্রীড়াঙ্গন। রাত্রে ম্যাচ হবে ; সন্ধ্যার মুখে পুলিশবাহিনী আসতে আরম্ভ করেছে। গ্যালারীতে লক্ষাধিক লোক বসতে পারে। জনরাজ হলেও শাসকগোষ্ঠীর জন্য পৃথক নির্দিষ্ট সুখাসন আছে। বলশই থিয়েটারে জার ও তাঁর পরিবারের জন্য পৃথক স্বর্ণাসন ছিল। গ্যালারীর নীচে শুনলাম চৌদ্দটা ব্যায়াম আখড়া আছে। বিচারকদের ঘর, পোশাক ঘর, চিকিৎসকের কুঠরী, টেলিভিশন দেখানোর ব্যবস্থা, সিনেমা এবং ভোজনালয়। সময় থাকলে শেষের ঘরটায় ঢুকতাম। কিন্তু এখনি চলতে হবে।

বড় স্টেডিয়ামের পাশে ছোট স্টেডিয়াম— তার পাশে

House of Sports— ক্রীড়াগৃহ। এটার উপর আচ্ছাদন আছে; এতবড় খেলার ঘর য়ুরোপে কোথাও নেই। পনেরো হাজার লোক গ্যালারীতে বসতে পারে। গেটের সামনেই নামলাম। ভিতরে যাবার বাধা হল না। গ্যালারীর পাশে দাঁড়াতেই কারা জায়গা করে দিল। বিদেশী বলে সর্বত্রই সম্মান পেয়েছি। কি বাস-এ, কি মেট্রোতে। গ্যালারী-ভরা লোক। খেলা হচ্ছে ভলিবল— মঙ্গোলীয়ান ও ইস্রেয়েলী দলের মধ্যে। খেলা দেখলাম শেষ পর্যন্ত। মঙ্গোলীয়ানরা জিতল। তারপর দুইদল দাঁড়াল— সোভিয়েত জাতীয়-সঙ্গীত গাওয়া হল— সবাই আসন ছেড়ে উঠল — যেমন সব দেশেই হয়। খেলার জায়গা লিনোলিয়ম-মোড়া, দূর থেকে সবুজ ঘাসে ঢাকা মনে হচ্ছিল। এখানে অনেক রকমের খেলার, এমন কি কন্সার্ট প্রভৃতি শোনবার ব্যবস্থা সহজে করা যায়। জাতীয়-সঙ্গীত গাওয়ার সময় সকল দর্শকই যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা তো মনে হল না। নূতন Generation-এর ছেলেরা সম্পদের মধ্যে বড়ো হচ্ছে— দুঃখের দিন তাদের শোনা কথা। তা না হলে ক্রুশ্চেভকে মাঝে মাঝে কড়া কথা বলতে হত না; আর আমাদের কাছ থেকে পথের দুটো ছেলে চুয়িংগাম চাইবে কেন? স্বর্গরাজ্যেও পাপ প্রবেশ করছে। সেদিন তো পাঁচটা ছোকরাকে নারীনিগ্রহ অপরাধের জন্য গুলী করে মারা হল।

খেলা দেখে হোটেলে ফিরলাম। চা খেয়ে ফের বের হলাম। দ্বিবেদীর সর্দি হয়েছে, তিনি বের হলেন না। কৃপালানী আর আমি, সঙ্গে বোরিস। বোরিস য়ুনিভার্সিটি থেকে এখানে চলে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এবার আমার অনুরোধে সবাই চলেছি মেট্রোতে বা পাতাল-যান চড়ে রসাতল ভ্রমণে। হোটেল থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি ধরলাম। খুব ঠাণ্ডা। জোর হওয়া বইছে—

তবুও বের হয়েছি। ট্যাক্সি শেয়ারে পাওয়া গেল— পাঁচ কোপেক করে দিতে হল ; অবশ্য খরচ যা কিছু, তা বোরিসই করছেন। ট্যাক্সি করে মেট্রোর প্রধান স্টেশনে এলাম। টিকিট নয়— পাঁচ কোপেক কলে দিলেই তুমি ঢুকতে পারবে। বোরিস স্লটে পয়সা দিচ্ছেন দেখে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ঢুকবার জন্য। বোরিস আমার জামা ধরে থামালেন। বললেন, স্লটে কোপেক না ফেলে গেলে অটোমেটিক কলে পথ আটকাবে ; স্লটে কোপেক পড়লে যন্ত্রদানব ঠাণ্ডা থাকেন। কোপেক-নৈবেদ্য না পড়লেই যন্ত্রাসুর তা টের পায়— অমনি দাঁড়া বের করে পথ রুখে দেয়! স্টেশনে ঢুকে এস্কেলেটর করে নীচে নেমে চললাম। এস্কেলেটর কি জানতেম, তার ছবি দেখেছি, তার পদ্ধতি জানি ; কিন্তু কখনো তা চড়ি নি। বোরিসকে ধরে টপ করে চলন্ত পথে পা দিলাম। দেখতে দেখতে তা সিঁড়ি হয়ে গেল। অতি উৎসাহী, ব্যস্তবাগীশদল সিঁড়ি দিয়েও নামছে অর্থাৎ তাদের ডবল গতিবেগ! পাশের চলন্ত সিঁড়ি উঠছে, লোকেরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে ; আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে চলেছি। নামবার জায়গায় বোরিস ধরে টানতেই নেমে পড়া গেল। সঙ্গী কৃপালানী বিদেশে গিয়েছেন বহুবার। চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন, নেমেছেন। আমরা যেখানে নামলাম, সেটা বিরাট স্টেশন, শ্বেতপাথরের মেঝে, থাম, দেওয়াল। ছাদের খিলানের মধ্যে মোজাইক করা ছবি— রুশী ইতিহাস থেকে ঘটনার চিত্র ; একটা ছবিতে পালটোবার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। জার পীটার সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসকে এই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। এই ধরনের বহু ছবি স্টেশনের ছাদে, প্রাচীর-গাত্রে আঁকা। প্রত্যেকটি স্টেশনে স্থাপত্য ও চিত্র পৃথক ধরনের। গাড়ি আসে বিদ্যুৎ বেগে — থামতেই দরজা খুলে যায় ; লোক নামে আগে, তারপর লোকে

ওঠে— নামা-ওঠা যুগপতে আমরা অভ্যস্ত— অর্থাৎ একটা দরজা দিয়ে একই সময়ে ধাক্কা দিয়ে নামি-উঠি— পকেটমারদের জীবিকার খোরাক জোগাই। এরকম ব্যবস্থা সোভিয়েতের রেলে, বাসে কোথাও দেখি নি, শুনিও নি। লোক উঠলে মুহূর্ত মধ্যে গাড়ি চলতে থাকে ও দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার মুখের গাড়িতে বেশ ভিড়। মনে হল কারখানা প্রভৃতি থেকে লোক ফিরছে। অনেকে বাজার করেও আসছে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি গ্রামের মেয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেল। মেট্রোর একটা স্টেশনে নামলাম, সেটার নাম হল রেভোল্যুশন; যুদ্ধের ছবি, বীরদের রণমূর্তি দিয়ে স্টেশনের প্রাচীর স্তম্ভগুলি সাজানো। প্রাচীরের গায়ে সিনেমার ছবি বা কুৎসিত ব্যাধির অব্যর্থ ওষুধের বিজ্ঞাপন-চ্যাপ্টানো কাগজ দেখলাম না। সুন্দর স্থানকে সুন্দর করে রাখতে এরা জানে। না রাখলে দণ্ড আছে, তাও অজ্ঞাত নয়। বাস্তববাদী এরা— তাই এরা জানে মিষ্টি কথায় সব কাজ হয় না; কোড়ারও দরকার আছে, দণ্ড কথাটার অর্থ তারা জানে। আর জানে, শক্ত কথায় হাড় ভাঙ্গে না— হাড় ভাঙবার হাতিয়ার শক্ত হাতে ধরতে হয়। হাওড়া স্টেশনের লালরঙ দেওয়া দেওয়াল পানের পিকে আরও লাল হয়ে ওঠে; কারও চোখে লাগে না। রুচিতে বাধে না। কুলিরা যেখানে বসে, সেখানে সমানে খৈনি খাচ্ছে আর থুথু ফেলছে— এ দৃশ্য কার চোখে না পড়ে? যাক্।

পাঁচ কোপেক দিয়ে মেট্রোয় নেমেছি— তারপর তিন-চার বার স্টেশন বদল করে, নানাদিকে ঘুরে উপরে উঠে এলাম। প্রায় একঘণ্টা পাতালপুরী ঘুরলাম। রাস্তায় যেতে যেতে মাঝে মাঝে দেখতাম, পাতালযান উপরে উঠে মস্কোনদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে।

বেশ দেখতে লাগে দূর থেকে, খেলনার গাড়ির মত। আসলে এটা পাতাল থেকে উঠে নদীর উপর সেতু পেরিয়ে আবার সুড়ঙ্গে ঢুকে মস্কোর অন্যতম রেল স্টেশন কিয়েভে যায়, অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার কিয়েভ শহরে যাবার স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে।

ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরলাম। যথাসময়ে ভোজনালয়ে এলাম। লিডিয়া আছেন, বোরিস কারপুসকিন আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যান। সারাদিনই তিনি আমাদের সঙ্গে ঘুরেছেন।

আজ খাবার হলে কন্সার্ট বাজছিল। কিন্তু নাচবার লোক দেখা গেল না। দুদিনের জন্য বন্ধুত্ব হয় ক্ষণেকের— তার পর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে— কে কোথায় চলে যায়— কখনো কারও সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। আমাদের দেশে ধর্মশালায় থেকেছি— সেখানেও ক্ষণেকের দেখা। কিন্তু অজানা-অপরিচিতেরা মিলে কোন জলসা, কীর্তন প্রভৃতি করতে দেখি নি।

আমাদের টেবিলে যে মেয়েটি দেওয়া-থোওয়া করে তাকে দেখতে পাচ্ছিনে আজ। তাকে একদিন তার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ; বলেছিল যে, সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা খাটতে হয়। একদিন ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বার-তের ঘণ্টা খেটে পরের দিন ছুটি পায়। মাসে সত্তর রুবল বেতন। বাড়ি ভাড়া সাড়ে তিন রুবল লাগে। তার খোঁজ নিলে লিডিয়া বললেন, তার মন খারাপ, কাল কাজে আসে নি— সারাদিন কান্নাকাটি করেছে। ব্যাপার কি ? তা হলে স্বর্গরাজ্যেও মেয়েদের চোখে জল পড়ে ? পড়ে বৈকি— মানুষ যে মানুষ— দেবতাও নয়, দানবও নয়— দুয়ে মিশিয়ে সে যে গড়া— সেটা ভুলে উৎসাহের আতিশয্যে মনে করে ওটা 'সব পেয়েছির দেশ'। শুনলাম স্বামী তার মোটর গাড়ি

কিনতে চায়; সে কিনতে দেবে না। সে বলে, মোটর গাড়ি কিনলে তার স্বামী ঘুরে বেড়াবে অন্য মেয়েদের নিয়ে। হায় রে নারী— সর্বদেশে, সর্বকালেই তুমি এক, সেই আঁকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা, সেই ঈর্ষা, সেই ব্যাকুলতা! মেট্রোতে দেখেছি— বিষাদময়ী প্রৌঢ়া নারী— দিনান্তের কাজের পরে ঘরে যাচ্ছে— তাকে বোঝাচ্ছে পাশের যাত্রিনী; চোখ তার ছল ছল, কিসের দুঃখ জানি না। আমি লিডিয়াকে শুধোলাম, 'শুনেছি স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ হলে সালিসী হয়।' উত্তরে শুনলাম, পার্টির মধ্যে মনোমালিন্য হলে, পার্টির থেকে মীমাংসার চেষ্টা হয়। তবে সব সময়ে তা যে সফল হয়, তা তো নয়।

আসলে এই সব সামান্য কথা আমাদের দেশে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়; ভাবখানা এই যে, সে দেশে দুঃখ নেই, বিবাদ নেই, বিষাদ নেই। সবাই শতাতপ মুনির নয়া সংস্করণ হয়ে চলাফেরা করছেন, নিয়ম পালন করছেন— তাসের দেশের হরতন, ইস্কাবনের দল! মানুষের সমাজে তা সম্ভব হয় না; হয় না— এই সহজ কথাটা বুঝতেও সময় লাগে— যখন দলগত মতামতের ঔদ্ধত্য সহজ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই বলছি, সোভিয়েত দেশ হলেও সেখানে সবই আছে— বিবাদ আছে, বিষাদ আছে, বিচারালয় আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টের দমন হয়; দুষ্টলোক আইনের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে পালাতে পারে না। শুনলাম, বিয়ে করা খুব সহজ, কিন্তু তালাক দিতে হলে একটু সময় লাগে। তবে মনের মিল হচ্ছে না বলে তালাক পাওয়া যায়। স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র খারাপ প্রমাণ করবার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীসাবুদ কাঠগড়ায় এনে যে রকম নোংরা কাদা আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত পত্রিকারা সমাজের মধ্যে ছড়ান, তা ওদেশে হতে পারে না। ও সব দেশে বিশেষতঃ বিলাতে তার জন্য

পৃথক কাগজ বের হয়। তার অসম্ভব কাটতি। কয়েক পেনি দিয়ে অতগুলো মুখরোচক খবর বা কেচ্ছা পাওয়া যায়— শনি-রবিবারটা কাটে ভাল।

সন্ধ্যার পর লিডিয়া আমাদের প্রত্যেককে ২৬·৮০ রুবল করে দিল খুচরো খরচের জন্য ; এটা অ্যাকাডেমি পাঠিয়েছেন। আমি হেসে বললাম— ছাব্বিশ রুবল আশী কোপেক কেন— সাতাশও নয়, ছাব্বিশও নয়। লিডিয়া এই গাণিতিক সমস্যার কোন উত্তর দিতে পারে নি।

১০

মস্কো

১৩ অক্টোবর ১৯৬২

স্নানাদি শেষ করে বের হবার জন্য তৈরি হয়েছি। লিখছি বসে নিত্য ভ্রমণকথা। এমন সময়ে ফোন এল— দানিয়েল চুক করছেন। ইনি বাংলা ভাষাবিদ্, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কাজ করেছেন। এলেন। কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময়ে বোরিস কারপুসকিন এলেন— যেতে হবে প্রাচ্য সাহিত্য অনুবাদ কেন্দ্রে। উক্রেইন হোটেল থেকে অনেকটা দূরে খাস সহরের মধ্যে — পুরানো বাড়িতে এই অনুবাদের দপ্তর। চার তলা পর্যন্ত লিফ্‌ট— তাও খুব পুরানো ধরনের। তার পর পাঁচতলায় হেঁটে উঠতে হয়। সেখানে এই বিভাগের কর্তারা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। অধ্যক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর দুই খণ্ড বের হয়েছে। আরও দশ খণ্ড বের হবে— কাজ চলছে। ইতিপূর্বে আট খণ্ডে বের হয়েছিল, সে সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। তা ছাড়া তাঁরা জানেন যে, সে অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক হয় নি। এবার তাঁরা মূলের ভাব রেখে ভাষান্তরিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় ও রুশীয় মিলে তর্জমা খাড়া করেন, তারপর রুশীয় ভাষানিপুণদের সাহায্য নেওয়া হয়। তখন তাকে অনুবাদ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোন একজনের উপর অনুবাদ নির্ভর করে না। পাস্তারনাক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা রুশী অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা উঠল। আমি বললাম, পাস্তারনাক স্বয়ং কবি, তিনি বাংলা জানতেন না : তাঁর অনুবাদ কতটা মূলের অনুগত হয়েছে বা হতে পারে তার বিচার করা কঠিন। আমি সেক্সপীয়রের জার্মান

অনুবাদের কথা পাড়লাম ; বললাম, Shakespeare Survcy বলে পত্রিকা বের হয়, তাতে পড়েছিলাম যে, স্লেগেল ভ্রাতৃযুগল উনিশ শতকের গোড়ায় সেক্সপীয়রের নাটকাবলী অনুবাদ করেন। স্লেগেলরা কবি ছিলেন, অনুবাদ অনবদ্য হয়েছিল। জার্মানরা সেই অনুবাদ গত দেড় শত বৎসর পড়ে আনন্দ পেয়ে আসছে। বর্তমান যুগের সাহিত্যিক ক্রিটিকরা বলছেন, স্লেগেলরা কবি ছিলেন, এই অনুবাদের মধ্যে তাঁদের কবিসত্ত্বা প্রকাশ পেয়েছে। সেক্সপীয়রের যথাযথ অনুবাদ হয়েছে কি না— তার যাচাই হওয়া দরকার। ফিটজেরাল্ডের ওমার খায়েমের কথাও পাড়লাম— বললাম সেটা মূল ফার্সি থেকে অনেক তফাত; ফিটজেরাল্ডের কাব্য নূতন সৃষ্টি— অনুবাদ নয়। আমি আরও বললাম, অনুবাদ ভাব-অনুগত ও শব্দ-অনুগত হয়েছে কিনা সেটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কথার ভাবে বুঝলাম— ভাবানুবাদ অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য যথাযথ ভাবে প্রকাশই এঁদের উদ্দেশ্য। ম্যাদাম কাজিতিনা বললেন, 'আপনাকে একটা অনুবাদ পড়ে শোনাই. আপনি ছন্দ দেখে ধরতে পারেন কি না দেখুন।' তিনি রুশ ভাষায় কবিতাটা যে ভাবে পড়লেন, তাতে মনে হল সেটা 'সোনার তরী'; 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষার' সঙ্গে ছন্দ মিলছে। হ্যাঁ, সত্যই তাই— সেটা 'সোনার তরী' কবিতারই তর্জমা।

রবীন্দ্র রচনাবলী যে দুই খণ্ড বের হয়েছে, তা আমাকে উপহার দিলেন। সেই দুই খণ্ডে নিম্নলিখিত বইগুলির অনুবাদ আছে।

১ম খণ্ডে— ৬০০ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা— গ্লাং চুক দানিয়েল চুক লিখিত

বউঠাকুরাণীর হাট— শেস্তোপালোবা

রাজর্ষি— বোরিস কারপুসকিন

গল্পগুচ্ছ— ২৮টি— তোব্‌স্তিক, দানিয়েল চুক, স্মিরনোভা, জিয়াকনোভা, কাফিচিনা ইত্যাদি

২য় খণ্ড—কবিতা ও নাটক

সন্ধ্যাসঙ্গীত ৩, প্রভাতসঙ্গীত ৪, কড়ি ও কোমল ১২, ছবি ও গান ৫, মানসী ২৯, সোনার তরী ১৪, চিত্রা ১৩ ও চৈতালি ২৫

প্রকৃতির প্রতিশোধ— কাফিচিনা

রাজা ও রানী— গরবোৎস্কি

চিত্রাঙ্গদা— কাফিচিনা

বিসর্জন— ৎসিরিন

জিজ্ঞাসা করা হল, রবীন্দ্রনাথের কোন বই সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছে। শোনা গেল 'গোরা'। ইতিমধ্যে ছয়টা সংস্করণ নিঃশেষিত, প্রায় ১০ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েছিল! আমরা শুনে স্তম্ভিত! কৃপালানী সাহিত্য আকাদেমির সম্পাদক, তাঁকে নানা ভাষা থেকে বই তর্জমার ব্যবস্থা করতে হয়, টাকা দেওয়া-নেওয়ার অনেক প্রশ্ন ভাবতে হয়। তাই তিনি সম্পাদক পুজিকোভকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সোভিয়েত দেশে যে সব বই ছাপা হয়, লেখকরা কিরকম রয়ালটি পেয়ে থাকেন। পুজিকোভ বললেন, সোভিয়েতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক; ব্রিটেন, আমেরিকা বা ভারতে বই বিক্রীর টাকার একটা অংশ লেখকদের দেওয়া হয়। সেভিয়েতে বই-এর পাতা হিসাব করে পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়ম। সাধারণ বই থেকে কবিতার বই-এর টাকা বেশি দেওয়া হয়ে থাকে— প্রতি পংক্তিতে দুই রুবল অর্থাৎ আমাদের আজকের মুদ্রা বিনিময়ে হবে দশ টাকার উপর। ফিরদৌসী তাঁর ষাট হাজার পংক্তি শাহনামার জন্য প্রায় এই রেটেই দাম চেয়েছিলেন। মিঃ পুজিকোভ বললেন, কোন কোন সময়ে বিদেশী লেখকদের বই ছাপলে ডলারে বা স্টার্লিং-এ মূল্য দেওয়া হয়ে

থাকে। অনুবাদকরা পাতা ও পংক্তি হিসাবে তাঁদের মেহনতের মূল্য পেয়ে থাকেন। এরা একবারেই টাকা দিয়ে সম্বন্ধ চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়। আমাদের দেশে অখ্যাত লেখকদের দশা যে কি, তা অনেকেই জানেন। তবে আজকাল নামী লেখকরা খুব সেয়ানা হয়েছেন, আর হবেন নাই বা কেন? জেলের পাছে ত্যানা আর· মেছুনির কানে সোনা— এটাই কায়েম হবে কেন? অনেক লেখক এখন নিজেরাই প্রকাশনী কারবার খুলে পাকাবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন।

আলোচনা হল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। বিষবৃক্ষ অনুবাদ হয়েছে। আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথা তুললেন একজন— আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের জয়গান কেন করেছেন? আমার মত জানতে চাইলে আমি বললাম— 'ভুলে যাবেন না, আনন্দমঠের ঘটনাটা অষ্টাদশ শতকের শেষদিক্‌কার। মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে; দেশে অরাজকতা; বাঙালীরা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ অবস্থায় ইংরেজের আসাটা যদি না হত, তবে আমরা আরও বহুকাল পিছিয়ে পড়ে থাকতাম। পাশ্চাত্ত্য জাতির আসা প্রয়োজন ছিল। আপনাদের কাছে কার্লমার্ক্স-এর মত উদ্ধৃত করা সমীচীন হবে না; তবু জানাচ্ছি। মার্ক্স লণ্ডন থেকে New York Daily Tribune-এ ১৮৫৩ সালে যে প্রবন্ধ লিখে পাঠান, তাতে আছে—

'Whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about the revolution.'

আমি বললাম, 'বঙ্কিম এই unconscious tool-এর কথাই কাব্যময় প্রতীকময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি ইংরেজের স্তাবকতা করেন নি।' বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সোভিয়েত লেখক ও পাঠকদের কৌতূহল বহুকালের। আজ থেকে আশী-নব্বুই বৎসরের

কথা; বঙ্কিমচন্দ্র তখনও জীবিত। সেই সময়ে রুশ পণ্ডিত মিনায়েফ বাংলা দেশে আসেন (১৮৭০ ও ১৮৮০ সালে)। তখন তিনি বঙ্কিমের বইগুলি কিনে নিয়ে যান। সেগুলি এখনো লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পড়াশুনা ও তর্জমা শুরু হয় সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হবার পর। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি— যাঁর কথায় আবার আমরা আসব— 'বন্দেমাতরম্' গান রুশভাষায় অনুবাদ করেন ১৯২৩ সালে। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস যা রুশভাষায় অনূদিত হয়, তা হচ্ছে 'চন্দ্রশেখর' (১৯২৮)। ...শ্রীমতী নোবিকোভা মহাযুদ্ধের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে এসে যাওয়াতে সব উলট-পালট হয়ে যায়। তাঁর থীসিস শেষ হল ১৯৫৩ সালে। বঙ্কিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত নিয়ে থীসিস লিখেছেন পেয়েভিস্কায়া। নোবিকোভার থীসিসের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন পত্রিকা'। সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত 'ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য সংকলন' গ্রন্থ .মধ্যে আনন্দমঠ, মৃণালিনী ও দুর্গেশনন্দিনী থেকে অংশ নির্বাচিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় অনুবাদ-বিভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদে মন দিলেন; রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর ও রাধারাণীর তর্জমা বের হয়ে গেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' অনুবাদ করছেন বোরিস কারপুসকিন; সে কথায় আমরা পরে আসব।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রুশীদের যেমন কৌতূহল, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে

---

১ তথ্যগুলি নোবিকোভা লিখিত প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' এপ্রিল ১৯৫৭।

তাদের আগ্রহ অনেক বেশি। তাই রুশভাষায় রবীন্দ্রচর্চার কথাটা এখানে বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, সোভিয়েত আমলেই রবীন্দ্রনাথের রচনার তর্জমা হচ্ছে। নোবেল প্রাইজ পাবার পর কবির খ্যাতি সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, জার-এর শাসনকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশভাষায় অনূদিত হয়। গীতাঞ্জলি, গার্ডনার, ক্রেসেণ্টমুন, চিত্রা, দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার, দি পোস্ট অফিস, গ্লিম্প্‌সেস অফ বেঙ্গল লাইফ প্রভৃতির। আমার কাছে ১৯১৭ সালের 'সাধনার' রুশ অনুবাদ আছে। এবার মস্কো থেকে ফেরার সময় দানিয়েল চুক সেটি আমায় উপহার দিলেন স্বহস্তে বাংলায় লিখে। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯১৩ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নানা বইয়ের প্রায় পঞ্চাশটা সংস্করণ হয়ে যায়; এর মধ্যে গীতাঞ্জলির এগারটা, গার্ডনারের দশটা সংস্করণ। কবির গ্রন্থাবলীর দুইটা সংস্করণ দুটো কোম্পানী প্রকাশ করে—'সোবরেমেনিজা প্রবলেমি' নামে প্রকাশনী কোম্পানী ছয় খণ্ডে (১৯১৪-১৬), ও 'পোতুর্গালবো' প্রকাশনী দশ খণ্ডে। বলা বাহুল্য এ সব ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়।

রুশীদের মধ্যে লেনিনগ্রাদ স্টেট য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি (Tubianski) প্রথম বাংলা শিখে মূল বাংলা থেকে কবির জীবনস্মৃতি ও কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা অনুবাদ করেন। এঁর বাংলা ছন্দজ্ঞান ভালই ছিল; এবং তাঁর অনুবাদে তিনি সেই ছন্দের ধ্বনি রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবির রচনার সমালোচনা ও মূল্যায়ন আরম্ভ হয় যুগপৎ। আনাটোলি-ভি-লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) সোভিয়েত রুশের নামকরা কম্যুনিস্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ্; তিনি 'ক্রাসনিয়া নিবা' পত্রিকায় (১৯২৩)

'ভারতীয় তোলস্তয়' নামক প্রবন্ধে গান্ধী ও তোলস্তয়ের তুলনা করেন; সেই প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

'The works of R. Tagore are so full of colours, of finest feelings and generosity that they truly belong to the treasures of the world culture.' Serge Oldenburg (১৮৬৩-১৯৩৪) নামে আরেকজন নামকরা পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের বহু প্রশংসা করেছেন; তাঁর গোরা ও ঘরে বাইরে বিশেষভাবে ভাল লাগে। গোরা ইংরেজি থেকে রুশ ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় ১৯২৪ সালে। ই. কে. পিমেনোভই অনুবাদ করেন। ১৯৫৬ সালে মূল থেকে অনুবাদ করেন ই. আলকনোবই, বোরিস কারপুসকিন; ই. স্মিরনোবই; সম্পাদনা করেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নোবিকোভা।

লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েতের বিশ বৎসরের ইতিহাসে স্তালিনের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্ব। এই সময়ের মধ্যে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে পনের দিনের জন্য কবি মস্কোতে আসেন; সে ইতিহাস সুপরিচিত। 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বই কবির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা পড়লে জানা যায়, কবির প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা এদের।

১৯৫৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বই রুশ ভাষায় তর্জমা হয়েছিল, তার অধিকাংশই ইংরেজি থেকে নেওয়া; একমাত্র তুবিয়ানস্কি কিছু কবিতা ভাষান্তরিত করেন মূল বাংলা থেকে।

১৯৫৫ সালে যখন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসেন, সেই সময়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদন মস্কোর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দপ্তর

থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত কবির বই-এর একটি তালিকা আনান ; সেই তালিকাটি ১৯৫৫ নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী নিউজ-এ ছাপা হয়েছিল। তাতে রুশ ভাষায় অনূদিত (ইংরেজি থেকে) চল্লিশটি বই-এর নাম পাই। বেইলরুশী, উজবেকী ও উক্রাইনী ভাষায় এক-একখানি করে বই-এর নাম পাওয়া যায়। মোট কথা, এখন পর্যন্ত মূল বাংলা শিখে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদ তেমন করে শুরু হয় নি।

১৯৫৫-৫৭-র মধ্যে কবির গ্রন্থাবলী আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে ছিল— ক্রুশেনী অর্থাৎ নৌকাডুবি ; দ্বিতীয় খণ্ডে গোরা ; তৃতীয় খণ্ডে ঘরে বাইরে ও শেষের কবিতা ; চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে গল্পগুচ্ছ ; ষষ্ঠ খণ্ডে মুক্তধারা প্রভৃতি নাটক, সপ্তম খণ্ডে কবিতা, অষ্টম খণ্ডে জীবনস্মৃতি ও রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের সামান্য অংশ এই আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবির জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, তা আরও ব্যাপক।

শুধু রুশ ভাষায় নয়, সোভিয়েতের প্রধান প্রধান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বই-এর তর্জমা হয়েছিল— আর্মেনিয়ান, তাজিক, তুর্কোমেনী, কারাকলপাস, মোলডাবী, বস্কিরী, কজাকী ও উজবেকী। নৌকাডুবি সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ওদের মধ্যে। তিন বৎসরে বারোটি ভাষায় নৌকাডুবির তর্জমা হয়— মুদ্রিত বই-এর সংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার। ঐ সময়ে নৌকাডুবির রুশী অনুবাদ বিক্রী হয় তিন লক্ষ পনের হাজার কপি। লাতাবিয়ার ভাষায় কার্ল ঈগলে-কৃত নৌকাডুবির ও নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ বিক্রী হয় আশি হাজার। এইসব সংখ্যা আমাদের কাছে কল্পনার অতীত। সোভিয়েত রুশের নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথেব অনূদিত বই-এর সংখ্যা যে কত,

সঠিক বলতে পারছিনে, তবে তা যে বহু লক্ষ— সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায়।[১]

অ্যাকাডেমি থেকে হোটেলে ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে উপরে গেছি— দিল্লীতে পত্র লিখছি ছেলেকে। ফোন এল নীচ থেকে; বোরিস করছেন— পায়োনিয়ার্স প্যালেসে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে, এখনি বের হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে পায়োনিয়ার্স প্যালেসে গিয়েছিলেন, সেটা নেই; এখন তার স্থলে সত্যই প্রাসাদ উঠেছে বটে। এই প্রাসাদ য়ুনিভার্সিটি মহলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বত্রিশ তলার ছাদে উঠে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ সেখানে উপস্থিত হলাম। বোরিস বা লিডিয়া— কেউই এদিকের অবস্থা জানতেন না, এখানে কখনও আসেন নি। যাই হোক, মোটরসুদ্ধ ঢুকে পড়া গেল।

প্রবেশ করতেই বুঝলাম— এখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছিলেন এবং আমাদের স্বাগতের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। চারটি মেয়ে আমাদের গাইড হল— এরা ইংরেজি জানে, আড়ষ্টও নয়, গায়েপড়া নয়, মূক নয়, মুখরা নয়। বেশ ভাল লাগল তাদের।

বাড়ীটি নূতন। মাত্র ১লা জুন (১৯৬২) খোলা হয়েছে, ক্রুশ্চেভ উন্মোচন করেন, তাঁর নানা ছবি রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো।

এখানে সাত থেকে পনের বৎসরের ছেলেমেয়ে যার যেটার দক্ষতা বা অভিরুচি সেটা শিখতে পারে। স্কুলের পড়ার সঙ্গে এর যোগ নেই। বালক-বালিকাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সহায়তা করবার জন্য বিচিত্র আয়োজন রয়েছে। একে বলা যেতে পারে হবি হাউস। রেডিও,

১ তথ্যগুলি পেয়েছি শ্রীমতী নোবিকোভার ইংরেজি লেখা থেকে। 'একতা' রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা।

টেলিভিশন, সিনেমা, নৃত্য, ব্যালে, ফোটোগ্রাফী, এরোপ্লেন মডেল প্রভৃতি শেখবার ব্যবস্থা দেখলাম। এ সবের পরিচালনা করবার জন্য শিক্ষিত লোক আছেন। ছেলেরা এরোপ্লেনের মডেল তৈরি করছে— প্রথমে কাগজ দিয়ে, তার পর কাঠ প্রভৃতি দিয়ে। কাগজের তৈরি মডেল আমাদের উপহার দিল ছেলেরা, আমি সযত্নে সেটা এনেছি এবং সাজিয়ে রেখেছি আমার ঘরে। ছেলেদের তোলা ফোটো টাঙানো রয়েছে— দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একটা হলে দেখি সারি সারি টেবিল— তার উপর দাবার সরঞ্জাম ; কোথাও দুজন তন্ময় হয়ে খেলছে। একটা ঘরে গেলাম ; গ্যালারি কলেজের লেকচার হলের মত— তবে একটা স্টেজ আছে। ছেলেরা গ্যালারিতে ব'সে, মঞ্চ থেকে একজন বক্তৃতা করছেন। একটি ছেলে কি প্রশ্ন করল। দোভাষী বোরিস বললেন, 'এটা দাবার ক্লাস'। ছাত্রটি একজন মার্কিন দাবা ওস্তাদ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করছেন। বুঝলাম, মনোসংযোগের বুদ্ধির কসরৎ শিখবার জন্য দাবাকে এরা এত বড় স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশে আগে খেলতাম কড়ি ছড়িয়ে 'গোলক ধাম' ; এখন খেলা 'লুডো', 'স্নেক-ল্যাডার', যে-সব খেলার মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রয়োজন হয় না, হাত সাফাই-এর হাতেখড়ি হয়— বৃদ্ধ বয়সে পাশা খেলি— সেখানও হাতসাফাই-এর কাজ !

দাবার ঘর থেকে নাচের ঘরে গেলাম। সেখানে দলবদ্ধ (group) নৃত্য শেখানো হচ্ছে পিয়ানোর সঙ্গে। অন্য ঘরে নৃত্যের ছন্দ, পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়ানো, হাতের আঙুলের মুদ্রা দিয়ে ভাব বোঝানো প্রভৃতি শেখানো হচ্ছে। আরেকটা ঘরে গেলাম— চার দিকে বড় বড় আয়না ; মেয়েরা ব্যালে ও জিমনাস্টিক নাচ অভ্যাস করছে। কসরৎ দেখবার মত। এই মেয়েরাই হয়ত

একদিন বলশোই থিয়েটারে নামকরা ব্যালে নর্তকী হবে। এই সব ছেলেমেয়েরা আসে বাসে, ট্রলিবাসে, মেট্রোতে; সঙ্গে মা-দিদিরা আসে। দেখলাম করিডরের বেঞ্চে মায়েরা বসে; তাদের পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, তারা শ্রমিক অথবা ঐ শ্রেণীর লোক। এক জায়গায় একটা ছেলে অপেক্ষা করছে দিদির জন্য। দিদি তখন একক ব্যালের নাচ শিখছে।

আমরা এদের আন্তর্জাতিক ঘরে গেলাম। সেখানে তারা আমাকে ছবি, বই, পুতুল উপহার দিল। আমিও তাদের জন্য ভারতীয় স্ট্যাম্প, আমার পৌত্র-পৌত্রীদের আঁকা ছবি, তাদের 'বন্ধুপত্র' দিলাম; কিছু ভারতীয় coins-ও দিলাম। কি খুশি এই সব পেয়ে। কিন্তু এ সব তারা প্যালেসের জন্য নিল, ব্যক্তিগত নয়।

ফিরছি খেলার জায়গার পাশ দিয়ে। নানা রকম খেলার সরঞ্জাম। এক জায়গায় দেখি, একটি ছোট ছেলে মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে কি বলছে— চারদিকে অন্য ধরনের পোশাকপরা অনেকগুলি ছেলে। যে ছেলেটি কথা বলছে, সে পায়োনীয়ার প্যালেসের সদস্য; আর যারা শুনছে— তারা পূর্ব জার্মানীর পায়োনীয়ার্স— দেশ ভ্রমণে এসেছে। সেদিন য়ুনিভার্সিটিতেও একদল বয়স্ক পূর্ব জার্মানীর অতিথিকে দেখেছিলাম।

প্রায় তিন ঘণ্টা কাটল পায়োনীয়ার্স প্যালেসে; বোরিসদের বললাম— এটা না দেখলে মস্কো সফর পূর্ণাঙ্গ হ'ত না। চিরদিন ছেলেদের মধ্যে কাটিয়েছি, তাই এদের দেখলেই আমার অতীত দিনের কথা মনে হয়। শিশুরা আমাকে ভয় করে না। আমার লম্বা চুল-দাড়ি দেখে তারা কৌতুক বোধ করে, ভয় করে সরে যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে পায়োনিয়ার্স কম্যুন দেখতে যান ১৯৩০

সালে, তার থেকে এখনকার প্যালেসের অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে।

প্যালেস থেকে বের হয়ে আসছি— ওভারকোট নিচ্ছি— একটি দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা। দাড়ি দেখা যায় না তো এখন। তাই আমরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি আলাপ করলেন ইংরেজিতে। দেখলাম ভদ্রলোক রবীন্দ্র-সাহিত্য জানেন— গার্ডনার থেকে গড়গড় করে খানিকটা মুখস্থ বলে গেলেন। ইনি যুদ্ধে ছিলেন, গালের এক অংশে ক্ষত হয় বলে দাড়ি রেখেছেন। লোকটির আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। কিন্তু দাঁড়িয়ে আলাপ করার সময় কোথায়? আমরা সময়ের সঙ্গে ছুটে চলেছি।

সন্ধ্যার পর সিনেমা দেখতে চলেছি। বোরিস দ্বিবেদীকে আনতে গেলেন— আমরা মোটরে উঠলাম। কৃপালানী বললেন— দ্বিবেদীর শরীর ভাল নয়, তিনি আসবেন না। আমরা মোটর থামিয়ে বোরিসকে উঠিয়ে নিলাম।

সিনেমা হলের কাছে গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। মোটরকার অসংখ্য দাঁড়িয়ে, কোন রকমে আমাদের গাড়ি তো পার্ক করা হল। কিন্তু টিকিট? বোরিস গেলেন টিকিট করতে। ফিরে এলেন— পাওয়া গেল না। এবার লিডিয়া চললেন। খানিক পরে এসে বললেন, 'নেমে এস, টিকিট পাওয়া গেছে।' আমরা একটু অবাক হলাম। বোরিস পেলেন না আর লিডিয়া পেলেন? সুন্দর মুখের গুণ নাকি?

এত বড় সিনেমা হল দেখি নি, ২৫০০ আসন; চেয়ারগুলি ছোট হলেও আরামের। বিরাট গ্যালারি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; আবার রাস্তার সমতলে নেমে লাউঞ্জ ও রেস্তোরাঁ।

পাওয়া যায়। শো আরম্ভ হল— গল্পটি নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়। রুশ ধনী ঘরের এক কন্যা পুরুষ সেজে যুদ্ধে গিয়েছে। যুদ্ধের দৃশ্য, সৈন্যদের আড্ডার দৃশ্য। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, তাদের বাড়ির পুরাতন কসাক সেবক তার সঙ্গ নিয়েছে। পথে এক আহত রুশ সৈন্য…ফরাসী-গুলীতে আহত হয়ে পড়ে আছে। তার কাছে সরকারী জরুরী কাগজপত্র ছিল, রুশ হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। ছদ্মবেশী মেয়েটি সেটি নিয়ে চলল। ছাউনিতে গিয়ে সেনাপতি কুজিনোভকে সেটা পাঠাল। কিন্তু সে যে মেয়ে এ কথা বলে দেন একজন ভদ্রলোক— যিনি তাকে পূর্বে চিনতেন। মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সে সৈনিক বিভাগে থাকবেই— ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়বেই। তার আগ্রহ দেখে কুজিনোভ মত দিলেন ও তাকে বীরের পদক পাঠিয়ে দিলেন। তার প্রেমাস্পদ যে যুদ্ধে এসেছিল তাঁকে উদ্ধার করে সে গেল।

সিনেমা শেষ হল। লাউঞ্জে ব'সে আছি— মোটর গাড়ি আসে নি। ফোন করে করে লিডিয়া গাড়ি আনাল। গেটে মেয়ে-রক্ষী পাহারায় আছে। একটা সাধারণ লোক ঢুকতে চেষ্টা করছিল, বোধ হয় টিকিট নেই— অতর্কিতে ঢোকবার চেষ্টায় ছিল, অথবা নেশাখোর। মেয়েরা তাকে ঠেলে বের করে দিল, কেন বুঝলাম না। অমরাবতীর প্রমোদালয়ে বিনা টিকিটে প্রবেশ নিষেধ— আর যার পয়সা কম সে টিকিটও কিনতে পারে না। অতএব…।

১১

মস্কো

১৪ অক্টোবর ১৯৬২

সকালে যথারীতি স্নানাদি করে তৈরি। দ্বিবেদীর ঘরে গেলাম। গতকাল তাঁর শরীর খারাপ ছিল বলে বের হন নি আমাদের সঙ্গে। ঘরে গিয়ে দেখি দুইজন ভারতীয় বসে। একজন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক, অপর জন ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র। ছেলেটি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের— নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়তে এসেছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা (Defence) বিভাগ থেকে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন, —ইউনিভার্সিটির হস্টেলেই থাকে। রুশ ভাষা ভাল করেই শিখতে হয়েছে ; এদেশে বিদেশী ছাত্রদের রুশ শিখতেই হয়। এ ভারতবর্ষ নয়— যেখানে ভারতীয় কোন ভাষা না শিখে বিদেশীরা জীবন কাটিয়ে দেয়— কয়েকটা পথ-চলতি হিন্দী বাত শিখে। কিন্তু ভারতের কোন ভাষা বিদেশী শিখবে ? মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-রূপে সে না হয় তামিল শিখল কিন্তু পঞ্জাবে গিয়ে সমস্যা হিন্দী— নাগরী, পঞ্জাবী, গুরুমুখী, কোনটা শিখবে ? এ সমস্যার সমাধান হয় নি। ইউরোপের প্রত্যক পৃথক রাষ্ট্রে যেমন পৃথক ভাষা, আমাদের দেশেও সেই অবস্থা। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলছে। মুশকিল হয়েছে, হিন্দী ভাষার মধ্যে দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক করতে গিয়ে ফল হয়েছে উল্টো। বিরোধ বেধেছে ভাষা নিয়ে, ভাষার সীমানা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের। সেভিয়েত দেশে রুশ ভাষা প্রায় আবশ্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে— বল্টিক সাগরতীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। এমন কি মঙ্গোলীয় সোভিয়েত রাষ্ট্র তাদের পুরাতন জবড়জং মঙ্গোলীয় লিপি ত্যাগ করে

রুশ লিপি গ্রহণ করেছে। মোট কথা, এই বৃহৎ রাষ্ট্রের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত এই রুশীয় লিপি ও রুশীয় ভাষা নানা জাতকে এক করেছে, তা সে বুরিয়াৎ হউক, আর উক্রেইনীয় হউক। প্রশ্ন ওঠে— গ্রীক ভাষা তো একদিন সমস্ত পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকাকে গ্রীক জগতের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল। ইহুদিদের এমন দশা হয়েছিল যে তাদের ধর্মপুস্তক গ্রীক ভাষায় তর্জমা হওয়ায় (সেপ্তুয়াজেণ্ট) তারা তা পড়তে পারতো; আর নূতন আন্দোলনের জনক যীশুখৃষ্টের জীবনী তো গ্রীক-ভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু সে গ্রীক ভাষা আজ কোথায় গেল পশ্চিম-ভারতে, উত্তর আফ্রিকায়! আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। পোর্তুগীজদের ভাষা একদিন পূর্ব এশিয়ার বন্দরে, হাটে, নগরেও চালু ছিল— কিন্তু কালস্রোতে সব ভেসে গেছে। ইংরেজি ভাষা ইংরেজের সাম্রাজ্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের কাছে 'আয়ার' (Ireland) দেশ আজ তাকে ত্যাগ করেছে। ভারত, যে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ— সেখানেও ইংরেজি মুরদাবাদ রব উঠেছে। আমেরিকায় তারা বলছে তাদের ভাষার নাম 'আমেরিকান'। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজি-ডাচে মিলিয়ে এক সঙ্কর ভাষা হয়েছে। ভাষার ভূত তৃতীয় পুরুষে দেখা দিতে পারে? তা যদি হয়, তবে উক্রেইনী, কাজাকী, উজবেকী, জর্জিয়ান এমন কি য়াকুৎ, বুরিয়াৎ প্রভৃতি ভাষাও একদিন আওয়াজ দিতে পাবেতো? কে জানে। জাতীয়তাবাদকে পোক্ত করবার জন্য ইস্রেলিরা ছত্রিশ দেশের ইহুদীদের এনে হিব্রু ভাষা শেখাচ্ছে; দ্বিতীয় পুরুষে এরা পুরাতন ভাষা ভুলে হিব্রু ভাষায় পাকা হবে। আমেরিকার নিগ্রোরা বহু শতাব্দী তাদের ভাষা হারিয়ে ইংরেজি নিয়েছে, কোথাও স্প্যানীশ। ভাষা সমস্যা যাক।

পৃথিবীতে বাইরের দূরত্ব যত কমছে, মানুষের মন যেন ততই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করছে। বাউলের গান মনে পড়ে— 'ভিতরে রস না জমিলে, বাইরে কি গো রঙ ধরে।' ভিতরের দেবতা না জাগলে বাইরের ভেদকে কি ভোলা যায়? অখণ্ড ভারতকে খণ্ড করেই স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়েছিল, তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েও খণ্ড-করার নেশাটা ছুটল না!

আজ প্রাতরাশের পর বের হলাম বোরিস-এর সঙ্গে ক্রেমলীন দেখতে। বহুবার তার পাশ দিয়ে রেড স্কোয়ার পেরিয়ে নানা স্থানে গিয়েছি এই কয়দিনের মধ্যে। দেখেছি তার লাল প্রাচীর, স্বর্ণচূড় শিখর। ক্রেমলীন দেখবার ছাড়পত্র প্রভৃতি পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। ছাড়পত্র দরকার, বিশেষ করে Arms Museum দেখবার জন্য।

ক্রেমলীন শব্দের অর্থ দুর্গ— আমাদের দিল্লী, আগ্রার লালকেল্লার মতন, লাল পাথরের প্রাচীর-ঘেরা, বহু যুগ ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রাচীরের উপর বিশ তোরণ— তার মধ্যে চোখে পড়বার মত স্পাসস্কায়া তোরণ— লেনিন মসোলিয়মের পাশে তার স্বর্ণবরণ শিখর বহুদূর থেকে দেখা যায়। সেটি এখন মস্কোর প্রতীক হয়েছে, যেমন জাপানের ফুজি পর্বত-শিখর, লণ্ডনের পার্লামেণ্টের ঘড়িশুদ্ধ চূড়া, নিউইয়র্কের লিবার্টির মূর্তি। ক্রেমলীনের এই তোরণের খাড়াই (২২১ ফুট) ৬৭·৩ মিটার। ১৮৫১ সনে এর শিখরে ঘড়িটি চড়ানো হয়— লণ্ডনের পার্লামেণ্টের ঘড়ি তৈরি হয়েছিল আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৬ অব্দে। ১৯৩৭ সনে ক্রেমলীনের পাঁচটি তোরণশীর্ষে রুবি তারকা দিয়ে সাজানো হয়, বিশেষ রকমের বিজলি বাতির ব্যবস্থা করায় রাতেও বহুদূর থেকে দেখায় তারার মত আকাশের গায়ে।

১৯৫৫ সন থেকে ক্রেমলীন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়; এর আগে এখানে স্তালিন থাকতেন— সর্বদাই কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল— জারের আমল থেকেও কড়া! আমরা হেঁটে চলেছি— পাশেই পড়ল বলশোই ক্রেমনিওভেস্কি অর্থাৎ বড় দুর্গ, মস্কো নদীর তীরে নির্মিত— সামনে দিয়ে বড় রাস্তা। পাশে একটা বিরাট বাড়ি, শুনলাম নিখিল-সোভিয়েত ও রুশীয়-সোভিয়েতের দপ্তরখানা— পূর্বে দুর্গ-প্রাসাদের অন্তর্গত ছিল।

আমরা প্রথমে ঢুকলাম ব্লাগোবেশচেন্স্কি ক্যাথিড্রালে; এটা সম্রাট তৃতীয় আইভানের সময়ে (১৪৮৪-৮৯) নির্মিত হয় পারিবারিক উপাসনার জন্য। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দেখলাম এখানে। এরপরে গেলাম আর্খেনগেলস্কি ক্যাথিড্রালে। এটা ষোড়শ শতকের গোড়ায় নির্মিত; এখানে সম্রাট ও বড় বড় রাজকুটুম্বদের সমাধি আছে। মহাচণ্ড আইভান নিজ পুত্রকে একদিন রাগের মাথায় স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন; সেই ছেলের কবর এখানে আছে। রুশীয় এক চিত্রকরের (Repin) বিখ্যাত ছবি আছে এই ঘটনা নিয়ে— সেটা দেখেছিলাম ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারিতে। এখানকার চার্চগুলি বৈজন্তীয়ম্ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আদর্শে নির্মিত, কারণ রুশীয়রা কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক চার্চের ধর্মমতে বিশ্বাসী আর সেখানকার পাত্রিয়ার্কই এদের ধর্মগুরু। এককালে এসব চার্চ ছিল বারাণসীর হিন্দুমন্দির বা আগ্রার চিস্তির কবরের ন্যায় জাঁকজমক, অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারপূর্ণ। গ্রীকচার্চে খ্রীষ্ট, মেরি ও সাধুদের ছবি রাখা হয়, হিন্দুদের মন্দিরে থাকে মূর্তি বা প্রতীক— যেমন শিবলিঙ্গ। মুসলমানদের মসজিদে কোন প্রতীক, মূর্তি কিছু থাকে না। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্যবোধকে চেপে মারা যায় না যে, তাই তো হিন্দু ও খ্রীষ্টানে দেবালয় সাজায় মূর্তি দিয়ে, ছবি দিয়ে— আর মুসলমানরা

তাদের সৌন্দর্যবোধের আনন্দ প্রকাশ করে পাথরের জালি কেটে বা ইটের বিচিত্র টালি বসিয়ে, খিলান, স্তম্ভ, গম্বুজ গড়ে। ক্রেমলীনের চার্চে Icon থাকে অর্থাৎ ছবি বা মোজাইক করা মূর্তি। এখন লোকে আসে মিউজিয়াম দেখবার উদ্দেশ্যে— পুরাকালের ভয় ভক্তি এখন নেই বললেই হয়; আর থাকলেও তা লোক দেখিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। পূর্বে বলেছি, মাত্র ১৯৫৫ সনে এ সব স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার হয়েছে।

ক্রেমলীন অন্তর্গত ঘন্টাঘর মহাচণ্ড আইভানই করিয়েছিলেন। কিন্তু মস্কোর বিখ্যাত ঘন্টা কোনো তোরণের উপর কখনও ওঠে নি, --ঘন্টাধ্বনিও কখনও শোনা যায় নি। সে যুগের বিখ্যাত ঢালাইকার আইভান মাতোরিণ ও তার ছেলে মিখাইল এটা ঢালাই করেন। এর ওজন ২০০ টন, অর্থাৎ ৫,৪০০ মণ। বিরাট এক গর্তের মধ্যে গলন্ত কাঁসা ঢালাই করে ঘন্টা তো তৈরি হল! কিন্তু তাকে ওঠাবে কি করে? কত প্ল্যানই হয়েছিল। সেই পাঁচ হাজার মণ ঘন্টা গর্তের মধ্যেই পড়ে থাকলেন। এমন সময়ে একদিন ক্রেমলীনে আগুন লাগল (মে ১৭৩৭); বিরাট এক জ্বলন্ত কাঠ ছিটকে এসে গর্তের মধ্যে পড়ে। তখন সেই আগুন নেবাবার জন্য জল ঢালার ফলে ঘন্টা যায় ফেটে— ১১ টনের টুকরো খসে গেল। একশ' বছর পর গর্ত থেকে ঘন্টাটাকে তুলে শ্বেতপাথরের এক মঞ্চের উপর রাখা হয়েছে। আমরা তাকে সেইভাবে সেখানে দেখলাম। ভাঙা টুকরা রয়েছে পাশেই। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় ঘন্টা আর নেই; এর পরেই হচ্ছে বার্মার মিঙানোর ঘন্টা। আমাদের মত কত দর্শক এসেছে এই ঘন্টা দেখতে। ঘন্টার ইতিহাস রুশভাষায় লেখা আছে; পড়ছে লোকে মন দিয়ে।

ঘন্টার পাশেই আছে জার-ক্যানন বা কামান। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে

নির্মিত হয়, এর ওজন ৪০ টন। পাশে গোলাও সাজানো। এসব এখন অতীতের 'কিউরিও'। মানুষ যেমন অতিকায় মাস্টাডিয়ন প্রভৃতি মূর্তি দেখে বিস্মিত হয় — এসব অস্ত্রশস্ত্র এখন লোকে সেই চোখে দেখে, কৌতুক অনুভব করে, বর্তমান যুগের মারণ অস্ত্রের কথা ভেবে শিউরে ওঠে

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ক্রেমলীনের এলাকায় দুইটি অট্টালিকা নির্মিত হয় ; তার একটির গম্বুজ রেড স্কোয়ার থেকে দেখা যায়, সেটির শিখরে সোভিয়েত পতাকা উড়ছে। এই বাড়ি ১৯১৮ সনের এপ্রিল মাস থেকে সোভিয়েত সরকারের দপ্তর, তার আগে ১৯১৭ নভেম্বর থেকে পাঁচ মাস পেত্রোগ্রাদের স্মোলনি প্রাসাদে ছিল — সে কথা পরে আসবে। মস্কোর এই সিনেটে লেনিন বাস করতেন ; তাঁর পড়বার ঘর ঠিক সেই রকম করে রাখা আছে। স্তালিনের দপ্তর ও থাকার জায়গা এখানেই ছিল— কেউ তো তাঁর নাম উচ্চারণ করে না। আমরাও শুধোই নি।

একটা বাড়ি দেখানো হল। এটাকে বলা হয় ক্রেমলীন থিয়েটার, বিদেশ থেকে যারা অভিনয় করতে আসে তারা এখানে অভিনয় করতে পারে। এই সময়ে বুলগেরিয়া থেকে একটি অভিনেত্রী দল এসেছিল ; অবশ্য আমাদের দেখবার সময় হয় নি।

ক্রেমলীন দেখতে কি ভিড়— পাঁচ বছরে পনের মিলিয়ন দর্শক প্রায় পঞ্চাশটি বিদেশ থেকে এসেছে।

এবার আমরা মিউজিয়ামে চলেছি— এর নাম ওরুঝিনায়া পালাটা বা অস্ত্রাগার। আর্মারি কেন বলা হয় জানি না। এটা ১৮৫১ সনে নির্মিত হয়। মস্কোর সম্রাটরা যখন থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তখন থেকেই বিদেশ থেকে উপঢৌকনাদি আসতে শুরু হয়। অতি মূল্যবান রত্নরাজি সোনা-

রুপার বিচিত্র বাসন ও পানপাত্র, অলঙ্কার ও পূজাপার্বণের সরঞ্জাম, স্বর্ণকারের সূক্ষ্মকাজ কত! দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাজমুকুট যা ১৪৯৮ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত বংশপরম্পরায় সম্রাটরা পরতেন উৎসবের সময়, সেটা রয়েছে। রাজমুকুট এখনো আছে, রাজার মুণ্ড নেই! বিদেশের দূতরা কত সামগ্রী আনতেন। সে স্তরে স্তরে সাজানো। পিটারের লৌহবর্ম, তাঁর বিশাল তরবারি: রাজারানীদের ঘোড়ার গাড়ি, সম্রাজ্ঞীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাঁটি কত যে দেখলাম তার বর্ণনা করা তো সম্ভব নয়। সব থেকে মজা লাগল ঘোড়ার গাড়িগুলো দেখে। বড় বড় গাড়ি চার-ছয় ঘোড়ায় টানত। রাস্তা-ঘাট ভাল ছিল না, দীর্ঘ পথ এইসব স্প্রিং-হীন গাড়ি করে কি আরামেই সব চলাফেরা করতেন! গাড়ি ঘোরাবার কল জানা ছিল না, তাই গাড়িটাকে উঁচু করে তুলে ঘোরাতে হত! গাড়িতে সোনালি কাজ, কাঁচের জানলা, সবই রয়েছে। ভাল ভাল গাড়ির কারিগর প্রায় দেখা যেত ইংরেজ। শিল্পকলার বেশির ভাগ নিদর্শন ফরাসী, জার্মান অথবা ইতালীয়।

আমাদের গাইড একজন ইংরেজি-জানা মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল। বেচারা খুব রোগা, একই জিনিস দিনের পর দিন দেখছে ও দেখাচ্ছে, একই কথা বলে যাচ্ছে। এ সবের বিস্ময় তার চোখ থেকে সরে গিয়েছে। আমরা যে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত কিছুকে দেখছি— তার দৃষ্টির মধ্যে সে আবেগ থাকতে পারে না। সে হয়তো ভাবছে— কখন ছুটি হবে— বাসায় গিয়ে মেয়েটাকে খাওয়াবে! কে জানে!

একটা কথা বলা হয় নি। এখানে প্রবেশের পূর্বে জুতোর উপর কাপড়ের জুতো পরতে হয়েছিল, কাঠের মেঝে, নাল-পরা জুতোর ঘসা লাগলে তার মসৃণতা থাকতে পারে না বলে এ নিয়ম

করা হয়েছে। আমার এক পায়ের উপরি জুতো কখন যে ভিড়ের চাপে খুলে গিয়েছিল টের পাই নি, চুপচাপ ঘুরে এলাম। ক্রেমলীন দেখা হল।

দূরে নূতন একটা বাড়ি— শুনলাম সোভিয়েত সদস্যদের সম্মেলনের জন্য আধুনিক ঢঙে তৈরি: কাঁচ ও লোহা, ক্ষণভঙ্গুর ও কট্টর মজবুত উপাদানে নির্মিত। ছয় হাজার ডেলিগেট বসতে পারে। ক্রেমলীনের স্থাপত্য ও আসবাব পত্রের সঙ্গে এই মার্কিনী-ঢঙের ইমারতটা ভীষণ বেখাপ্পা ঠেকছে। কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকলে কি হয়— ঝোঁক ত মার্কিনমুখী বিলাস, বৈভব, ঐশ্বর্য! অবশ্য এরা বলে সে বিলাস, ঐশ্বর্য সকলের জন্য দেবে! সম্ভব এখনও হয় নি, কবে হবে তা মহাকাল ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

ক্রেমলীন থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে মসোলিয়মের দিকে আগাচ্ছি। পাতালপুরে লেলিনের মৃতদেহ রাখা আছে। বিরাট জনতার সারি, এখান দিয়ে যাবার সময়ে প্রতিদিনই দেখেছি। এবার সেই জনতার মধ্যেই পংক্তিবদ্ধ হলাম। আমাদের দোভাষী-বন্ধু বোরিস স্থানীয় পুলিশ গার্ডদের কি যেন বললেন, তখনই প্রবেশ-দ্বারের অল্প দূরেই পংক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে পেলাম। পংক্তির শেষে দাঁড়ালে ঘণ্টাখানেক লাগত। ধীরে ধীরে চলেছি— টুঁ শব্দ নেই। প্রবেশ মুখে দুইজন শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে— দেখলে মনে হয় অচল প্রস্তরমূর্তি। নীচে সিঁড়ি বেয়ে নামছি— নামছি। একটু গলি পার হয়ে দেখলাম একটি কাঁচের শবাধারে লেনিন শায়িত, একটা কৃত্রিম আলো তাঁর দেহের উপর পড়েছে; অন্যত্র বিজলি বাতি স্তিমিত। দাঁড়াবার নিয়ম নেই। কবরটি প্রদক্ষিণ করে অন্য পথে আমরা বের হয়ে এলাম রেড স্কোয়ারে। এই মসোলিয়মের কাছেই সরকারী মঞ্চ— যেখান থেকে সোভিয়েত কর্তারা উৎসবাদি দেখেন;

তার ছবি প্রায়ই কাগজে দেখা যায়। কবর পূজো, মূর্তি পূজো, প্রতীক পূজো এক যায় আর আসে। খ্রীষ্টীয় আইকনের স্থান নিয়েছে লেনিনের ছবি।

শুনেছি ও পড়েছি স্তালিনের মৃতদেহ এই কবর-গৃহে ছিল লেনিনের পাশে। আজ স্তালিনের নাম শোনা যায় না— আমরাও কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম না স্তালিনের দেহ কোথায় কবরিত হয়ে আছে। ক্রেমলীনের কোথায় স্তালিন থাকতেন শুধিয়েছিলাম দোভাষী বন্ধুকে ; তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন 'জানি না'। তাই তাঁর কবর কোথায়— সে প্রশ্ন করে তাঁকে বিব্রত করলাম না। বুঝলাম, এরা 'জানি কিন্তু বলব না'র পন্থাশ্রয়ী। স্তালিনের নাম আজ সোভিয়েত রুশে কেউ উচ্চারণ করে না ; অথচ পঁচিশ বৎসর তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাটতুল্য! আজ যাঁরা মৃতের উপর খড়্গ মারছেন, তাঁরা তো নীরবে তাঁর স্বৈরাচারকে মেনে নিয়ে চলেছিলেন বহু বৎসর। লেনিন তাঁর টেস্টামেণ্টে লিখে গিয়েছিলেন যে স্তালিনকে যেন সর্বকর্তা না করা হয়। কিন্তু এঁরাই তো তাঁকে বাড়িয়েছিলেন। এখন তাঁকে অপমান করলে তিনি কোন উত্তর দিতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর জীবনকালে প্রতিবাদ করার সাহস তো হয় নি। মানুষ যত অপরাধই করুক, মৃত্যুর পর তার কবরিত দেহকে এ ভাবে লাঞ্ছনা করার কথা ভাবতে ভাল লাগে না। মনে পড়ছে অলিভার ক্রমওয়েলের কবরও বোধ হয় সরিয়ে দেওয়া হয়। সকল ডিক্টেটরেরই কি একই পরিণাম? আগে দ্বৈরথ যুদ্ধ হত ; মল্ল বা মুষ্টিযুদ্ধ সীমিত থাকত দু'জনের মধ্যে। এখন একই দেশের মধ্যে দলের সঙ্গে দলের লড়াই, মতভেদ দিয়ে শুরু হয়ে মস্তকচ্ছেদে অবসিত হয়। পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগসাজসের সন্দেহে স্তালিন কত লোককে হত্যা করেছিলেন। সেই সব পাপের একি

প্রায়শ্চিত্ত ? ১৯৩৫-এর পার্জ বা বিতাড়নের ইতিহাস মনে পড়ছে— সেই প্রকৃতির প্রতিশোধ এমনিভাবেই হয়।

আজ স্তালিনের নাম কেউ করে না, যেমন বেরিয়ার নাম ভুলে গেছে ; সরকারী ইতিহাস কাগজপত্র থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। জর্জ ভি. চিচেরিন (Chicherin) ১৯৩৬ সনে অপমানের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ; তার পূর্বে বার বৎসর তিনি ছিলেন সোভিয়েত বৈদেশিক সচিব। স্তালিনের কোপদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর নাম মুছে যায়। পঁচিশ বৎসর পরে তাঁকে 'পুনর্জীবিত' করা হয়েছে কয়দিন আগে। নাগর দোলায় কখন কে উপরে চড়ে, আর কখন কে নীচে নেমে আসে, আখমাড়া কল থেকে ছিবড়ের মত বেরিয়ে যাবে— সে ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় বিধাতাও করতে পারেন না। মলোটভ, ভোরসিলোভ, বুলগানিন— কোথায় তাঁরা ?

ক্রেমলীন ও মসোলিয়ম দেখে ফিরছি। আজ রবিবার। ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত, কারণ আজ সরকারী ড্রাইভারদের ছুটি ভোগের দিন। তাই আমরা মেট্রোর পথে ফিরলাম। দ্বিবেদী মেট্রো দেখেন নি বলে ইচ্ছা করেই এই পথ নেওয়া। না হলে ট্রলিবাস ধরতাম। মেট্রো থেকে বের হয়ে বাস পেলাম। সেটা হোটেলের কাছ দিয়েই যাবে। বাস-এ এত দিন চড়ি নি, অর্থাৎ চড়বার প্রয়োজন হয় নি— আকাদেমির গাড়িতে ঘুরেছি। বাসে উঠে দেখি কণ্ডাক্টার নেই— সকলেই পাঁচ কোপেক স্লটে ভরে দিচ্ছে আর একখানা করে টিকিট ছিঁড়ে নিচ্ছে। বিনা টিকিটে যাবার সাহস হয় না— কারণ অন্য আরোহী তো আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষের দুষ্টবুদ্ধি হয়। ইনস্পেক্টর হঠাৎ এসে চেক করেন, তখন বিনা টিকিটওয়ালা বিপদে পড়ে। তার. নাম-ধাম-লিখে, সে যেখানে কাজ করে, সেই

কারখানায় বা অফিসে ফোটোসুদ্ধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে হবে! দেশের কথা মনে হচ্ছিল। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া কমছে না তো। গান্ধীজি বলেছিলেন, বিনা টিকিট যাত্রীরা যতক্ষণ না ভাড়া দেবে, ততক্ষণ গাড়ি ছাড়া হবে না। জানি না, ভারতে কবে মানুষের শুভবুদ্ধি হবে! যে লোক সরকারী টাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপহরণ বা অপচয় করে, সে যে দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিত্ত অপহারক, সে-কথা দেশবাসী যেন বুঝতে পারে না অথবা বুঝেও ঝঞ্ঝাটের ভয়ে চুপ করে যান। 'কে বাবা হাঙ্গামা পোহায়! সাক্ষী দিই তারপর ঘর ও কোর্ট করি আর কি! মরুক গে— যা হয় হোক'— এই হচ্ছে বেশির ভাগ লোকের ভাবনা! কোনো রাজ্যের ছাত্ররা ট্রেনে টিকিট কাটতে চায় না, টিকিট কাটলেও উপরের ক্লাসে বসে যাবে— শুধুলে বলে 'বিদ্যার্থী হ্যায়'— অর্থাৎ ছাত্র বলে সরকারকে ফাঁকি দেবার অধিকার আছে।

লাঞ্চ খেয়ে উঠতেই প্রায় বেলা তিনটা হল। বোরিস বললেন— বিকালে আজ আকাডেমিশিয়ান ব্রাগিনস্কির (Braginsky) বাড়িতে চা-এর নিমন্ত্রণ। ইনি পার্সি ও মধ্য-এশিয়ার ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত, Institute of Peoples of Asia-র সাহিত্যিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

পাঁচতলার উপর একটি ফ্ল্যাট-এ তিনি থাকেন। এই প্রথম মস্কোতে পণ্ডিতদের ঘরবাড়ি দেখলাম। যে ঘরে তিনি পড়াশুনা করেন, সেই ঘরেই আমাদের চা-এর ব্যবস্থা হয়েছে। নিজেই সব কাজ করছেন, ঝি-চাকর দেখলাম না। অথচ খাদ্যবস্তুর প্রচুর আয়োজন করেছেন। দ্বিবেদীর সঙ্গে হিন্দী, পারসি, ছন্দ, মাত্রা প্রভৃতি নিয়ে কথাবার্তা চলল। কৃপালানী সাহিত্য আকাদামির

কাজকর্মের কথা বললেন, আমি বিশ্বভারতীতে যে-সব গবেষণার কাজ চলছে সে সম্বন্ধে বললাম। পার্সি কবিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমি শুধুলাম, প্রেমের কবিতা ইসলামী সাহিত্যে অজানা প্রেমিকের জন্য লিখিত হয়েছে; ওদের সমাজে নারী ছিল অদৃশ্য-হারেমে বদ্ধ; তাই অজানা, অচেনার জন্য আকুতি-কাকুতি কবিতায় উছলে পড়েছে। পূর্ববঙ্গেও এই শ্রেণীর গান বাঙলা ভাষায় আছে; এটা আরবদের প্রভাবে হতে পারে। আসলে স্প্যানীশ-আরবদের মধ্যে থেকে অজানার জন্য প্রেমের কবিতা লেখা হত; বাদশাহরা লিখতেন রাশি রাশি কবিতা। আরবদের কাছ থেকে এই ঢঙটা ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পেত্রার্ক প্রভৃতিরা য়ুরোপে প্রেমের নূতন কবিতার প্রবর্তক হন। আমার প্রশ্ন আরবদের উত্তরসূরীরূপে এদেশের মুসলমান কবিরা এই শ্রেণীর কবিতা ও গান লিখেছিলেন কিনা; কিন্তু প্রশ্নের জবাবটা চাপা পড়ল। অধ্যাপক বললেন, প্রেমের তুটো দিক ইসলামী কাব্যে রূপ নিয়েছে; একটাকে বলা যেতে পারে— 'আজারিয়া'— এটা না-পাওয়া প্রেমের জন্য আপশোষ, অপরটি 'ওমারিয়া' বা সম্ভোগের কবিতা। কিছু হল না, কিছু পেলাম না বলে কবিরা সব দেশেই আকুলি-বিকুলি করে আসছেন; এটাই বিরহের কাব্য, সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, এই বিরহ-বেদনা। যাক এ নিয়ে অনেক কথা বলবার আছে, কিন্তু এখানে সেটা চলতে পারে না। Braginsky তাঁর একটা রচনা দিলেন পড়তে— রচনাটা রুশ ভাষায় তাঁদের পুস্তিকায় বের হয়েছিল; অনুবাদ করেছেন আমাদের জন্য। তার মধ্যে অনেক ভাববার কথা আছে।

ব্রাগিনস্কির বাসা থেকে বের হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। চলেছি বলশোই থিয়েটারে। টিকিট করা ছিল। কিন্তু লিডিয়ার

দেখা নেই। ছুটতে ছুটতে এল সে; কিন্তু কয়েক মিনিট দেরি হওয়াতে আমাদের ঢুকতে দিল না। লিডিয়া বুঝিয়ে বলাতে মহিলা-দ্বারী বলল— অপেক্ষা কর। অন্য কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না— কারণ 'শো' আরম্ভ হলে কেউ দর্শকদের বিরক্ত করে ঢুকতে পান না। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা দিকে দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিল। পিছনে একটা চেয়ারে স্থান পেলাম। একজন ভদ্রলোক ভাল জায়গা আমাকে ছেড়ে দিলেন। একটা দৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, যখন আলো জ্বলল, তখন আমাদের জায়গায় যেতে পেলাম। সাড়ে তিন রুবলের টিকেট— দ্বিতীয় পংক্তিতে জায়গা। সেখানে বসে বসে ঘরটা চোখে পড়ল। বিরাট মঞ্চ। এই থিয়েটার তৈরি হয় ১৭৮৪ সনে; কিন্তু বছর ত্রিশ পরে আগুনে যায় পুড়ে, থাকে বাইরের প্রাচীরগুলো ও সামনেটা। ১৮৫৬ সনে নূতন করে তৈরি হয়— সেটাই এখন আমরা দেখতে পাই। ঘরটি লম্বায় পঁচিশ মিটার, প্রস্থে ছাব্বিশ মিটার, উচ্চতায় একুশ মিটার। এত বড় স্টেজ দেখা যায় না— ২৩·৫ মিটার সামনেটা, গভীর পঁচিশ মিটার। প্রায় হাজার লোক কাজ করে এই প্রতিষ্ঠানে। ব্যালে নাচিয়ে ২৫০-এর উপর। নাচের সময় পিলপিলিয়ে আসতে লাগল— কত যে বলতে পারি নে।

চারদিকে বসবার বক্স পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। মঞ্চের সামনে সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের বসবার সিংহাসনসদৃশ স্থান। সমস্ত বাড়িটা যেন সোনা দিয়ে মোড়া। ছাদের উপর গ্রীক পুরাণের ছবি। এ সবই জারদের সময়ের তৈরি। সোভিয়েত যুগে পরিবর্তনের মধ্যে হয়েছে— এখন এটাতে যে ১·২০ রুবল খরচ করতে পারে সেই জায়গা থাকলে ঢুকতে পারে; পূর্বে ছিল বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের জন্য মাত্র। এখন সবসুদ্ধ প্রায় চার হাজার দর্শক বসতে পারে।

মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্বন্ধে শুনলাম, এখন একটু পিছিয়ে পড়ছে তারা। এককালে এদের দল লণ্ডন, প্যারিস, টোকিও প্রভৃতি মহানগরীতে গিয়ে নাম করে এসেছিল। এখন বলশোই থিয়েটারের চাহিদা বেশি। Don Quixote গল্পটাকে নিয়ে এরা ব্যালে তৈরি করেছে। রুশীয়রা বলে 'ডন্‌কিওঠ'। ব্যালে নাচ পূর্বে দেখি নি ; মেয়েরা স্বল্প পরিচ্ছদে, পুরুষরাও তাই। কিন্তু কি বলিষ্ঠ ও ছন্দোময়ভঙ্গি— তা না দেখলে বুঝা যায় না। মেয়েদের দেখে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতা। সমস্ত কামুকতার উর্ধ্বে উঠে যেন তারা নৃত্যকলায় তন্ময় হয়ে আছে। একজন নাম-করা নৃত্যশীলা আসাতে দর্শকদের কি হাততালি! স্প্যানীশ গ্রামের দৃশ্য, ডন কুইক্সটের ঘোড়ায় চড়ে আসা, স্যাংকোর গাধায় চড়া, উইণ্ডমিলের সঙ্গে লড়াই এবং তার পর মিলের পাখায় ডন কুইক্সটের ঘুরপাক খাওয়া প্রভৃতি এমন ভাবে করেছে, যেন মনে হয়, সত্যই সপ্তদশ শতকের স্প্যানীশ গ্রামে আছি, সেখানকার বাজার, খাবার দোকান— সব দেখছি। মেয়েদের নাচ— বুঝলাম সাধনা। পায়োনীয়ার প্যালেসে মেয়েদের শিক্ষানবীশী করতে দেখেছিলাম— কি কসরৎ করতে হয়! Menkus নামে সঙ্গীত-বিশারদ এটাকে ব্যালে রূপ দেন।

১২

মস্কো

১৫ অক্টোবর ১৯৬২

সকালে ঘরে একাই আছি। বোরিস এলেন, হাতে তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী— সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, আর কমলাকান্তের দপ্তরের রুশ অনুবাদের প্রুফ। দুই-একটা জায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন ; মুশকিল এই যে, আমরা বাঙলা পড়ি চোখ বুজে— মাতৃভাষা বলে তাকে পড়ি, অধ্যয়ন করিনে মন দিয়ে। যে কয়টা প্রশ্ন করলেন, তা আমার পক্ষে ঠিকভাবে বুঝান শক্ত হল। বোরিস বাঙলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছেন, ব্যাকরণের উপর একটা বইও লিখেছেন। ইনি বহুকাল মস্কো রেডিওতে কাজ করেছিলেন বাঙলা বিভাগে, ভারতে এসেছিলেন রুশ সার্কাসের দোভাষী হয়ে। বাঙলা ছাড়া হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা জানেন। ভাষা ভাসাভাসা শেখেন নি এবং রসবোধ আছে বলে কমলাকান্তের রসিকতার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ হয়েছে। গতকাল 'আনন্দমঠ' নিয়ে যে তর্কটা উঠেছিল, আজ বোরিস সেটা আবার ঝালাতে চাইলেন। আমি কালকের কথাই বললাম। যে-কালের কথা বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন— সেটা ভুললে চলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ নিয়ে কথা উঠল। আমি বললাম, তিনি যে যুগের মানুষ তখন হিন্দু সমাজের শিক্ষিতেরা রাজনীতির চর্চা শুরু করেছেন— তার জাতীয়তা হিন্দুত্বমূলক। বোরিসের 'আনন্দমঠ' খুব ভাল লাগে— বন্দেমাতরম্ বা জাতীয়তা-উদ্দীপক গান আছে বলে। আমি বললাম, সেটাই তো হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা। কোন মুসলমানের পক্ষে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করা কঠিন, 'মাদার কন্‌সেপ্ট' ইসলামে অজ্ঞাত। সুতরাং বন্দেমাতরম্

ধ্বনি ও গীত নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে বাঙলা দেশে— হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল এটা। হিন্দুর পক্ষে 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজ দেওয়াটা অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে ওঠে, প্রায় রাজনৈতিক ধর্মরক্ষার সামিল ; এবং মুসলমানের পক্ষে ঠিক ঐ কারণেই অশ্রাব্য মনে হয়— কারণ সেটা হিন্দুর শ্লোগান।

প্রাতরাশের জন্য নীচে নেমে এসে নিজেদের টেবিলে বসে খাচ্ছি ; অন্য টেবিলে একজন ভারতীয় বসে— কালো চাপদাড়ি, দেখছেন আমাকে অনেকক্ষণ থেকে। এসে আলাপ করলেন। কেরালার লোক— সিরীয়ান খ্রীষ্টান, জেনেভাতে বিশ্ব খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের একটা সম্মেলন হবে। তাতে রোমান ক্যাথলিক ছাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট, গ্রীক চার্চ, সিরীয়ান চার্চ, সব সম্প্রদায় যোগদান করছে। ইনি সোভিয়েতে এসেছেন এখানকার চার্চের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য। অনেকের ধারণা যে, সোভিয়েতে ধর্ম লোপ পেয়েছে। কথাটা আধাসত্য।

সত্যকথা, ধর্ম লোপ পেয়েছে সব দেশেই ; বুদ্ধিমানেরা মানে না ; চতুররা অন্যদের মানাবার জন্য ধর্ম নিয়ে আড়ম্বর করে। তবে তা ধর্ম নয়—ধার্মিকতা, কতগুলো কুসংস্কারের খোসা দিয়ে ধর্মের ক্ষুধা নিবৃত করার অপচেষ্টা মাত্র। আধুনিক কালে ছেলেমেয়েরা সব দেশেই যেমন, এখানেও তেমনি— কিছুই মানে না। আমাদের দেশে মানমার ভড়ং আছে। পাঁড় অব্রাহ্মণ কম্যুনিস্ট— অসবর্ণ বিয়ে করছে, অথচ বামুন ডেকে কুলাচার রক্ষা করছে! সোভিয়েত যুবকরা সেটা করে না। চার্চ অনেকগুলো আছে মস্কোতে ; ক্রেমলীনের মধ্যে চার্চ-এর কথা তো আগেই বলেছি।

খ্রীষ্টান গ্রীক চার্চ ছাড়া আর্মেনিয়ান চার্চ, ইহুদীদের সিন্যাগগ্, মুসলমানদের মসজিদ সবই আছে। অবশ্য এ সব দেখবার অবকাশ

হয় নি— দূর থেকে ইমারতগুলো দেখেছি। লেনিনগ্রাদের বিরাট মসজিদ দেখি পরে।

কেরালার সেই খ্রীষ্টান ভদ্রলোককে পরদিন আর দেখি নি, বোধ হয় নিজের কাজে বের হয়ে গেছেন। মুসাফিরখানায় দেখা— তার পর ?

এবার যেতে হ'ল বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ পরিষদে। একটি ঘরে আমরা বসলাম; এখানকার সাজসজ্জা অ্যাকাডেমি থেকে ভাল মনে হল। এই পরিষদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্বন্ধে রুশদের ওয়াকিবহাল করা। গ্রীক, লাতিন থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রুশ ভাষায় তর্জমার ব্যবস্থা করার আয়োজন হয়েছে। এঁরা 'বিশ্বসাহিত্য কোষ' বহু খণ্ডে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নামকরা সাহিত্যিকরা অনুবাদে হাত দিয়েছেন। এঁদের মত— ভাব রক্ষা ক'রে অনুবাদ সার্থক করা। কথাটা ভাবলাম। সত্যই তো। আজও বাঙালী কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতই তো পড়ে; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের রামায়ণের অনুবাদ বা কালীপ্রসন্ন সিংহের অথবা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত পণ্ডিতে পড়ে — সাধারণে তা ছোঁয় না। তুলসীদাসের রামায়ণই তো উত্তর ভারতের হিন্দীভাষীদের কাছে বেদের সম্মান লাভ করেছে। এ সব তো খাঁটি অনুবাদ নয়। আমি বললাম, শুনেছি পাস্তারনাক রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছু অনুবাদ করেছেন; লোকে বলে তাকে চেনা যায় না, অর্থাৎ তিনি বাঙালী কবির ভাবটা নিজের মতো করে রুশ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এটা স্বাভাবিকই; তিনি তো আর বাঙলা মূল দেখেন নি। আর বললাম— ফিটজেরাল্ডের ওমরখায়েমের অনুবাদ— সেটা ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে অমর স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু তা ওমরখায়েমকে প্রকাশ করে নি। রবীন্দ্রনাথের কবীরের অনুবাদও সেই গোত্রের অন্তর্গত বলেই আমি মনে করি। কবীরের কথা থেকে কবির বা ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যাখ্যাটাই বড় হয়েছে; পণ্ডিতে বলে কবির কলমে কবীর আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। কথায় বলে 'তিন নকলে আসল খাস্তা'; এখানে তিন তর্জমায় আসল চাপা।

আলোচনা বেশ জমেছিল। প্রায় দুইটার সময় পরিষদ থেকে বের হলাম। হোটেলে এসে লাঞ্চ খেয়ে উঠতে বেলা তিনটা বেজে গেল। নীচেই পোস্টাপিস আছে; কলকাতায় কাবেরী ও শান্তিনিকেতনে সুমন্ত্রকে পত্র লিখলাম— ছবি পোস্টকার্ডে।

লাঞ্চের পর চলেছি অ্যাকাডেমিতে। আজ সেখানে রোএরিখের স্মৃতিসভা। এ বাড়িতে আগে দু'বার এসেছি কিন্তু যেখানে সভা হল সেদিকটা দেখি নি। আমরা মঞ্চে বসলাম, সামনে ডক্টর জয়পাল ছিলেন— স্বাগত করলেন। ইনি এখন ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত— গত তেরোই রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্ত দিল্লী ফিরে গেছেন; তাঁর স্থানে মিঃ কাউল আসবেন।— জয়পালই এখন কাজ চালাচ্ছেন। এঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় এম্বেসিতে— দেশে ফেরবার আগে। সভায় রোএরিখ সম্বন্ধে রুশ-ভাষায় প্রশস্তি পাঠ করলেন। বিদেশী অতিথি আমাদের নাম করা হল— এইটুকু বুঝলাম। সভাশেষে রোএরিখের ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হল। দেশে ফেরার পর সোভিয়েত ল্যাণ্ড কাগজে হঠাৎ দেখি আমার ছবি— এই সভাশেষে কথা বলছি কার সঙ্গে।

এবার সহকারী ডিরেক্টর অ্যাকরমোভিচ অ্যাকাডেমি প্রকাশিত গ্রন্থরাশি দেখাতে লাগলেন। প্রাচ্যের সমস্ত ভাষা নিয়ে এঁরা চর্চা করছেন। দুনিয়াটাকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। বিদেশের ভাষা

শিখে, তাদের সাহিত্য না পড়ে মানুষকে জানা যায় না, একথা সোভিয়েত রুশীয়রা ভাল করে বুঝেছে। ভারতীয় ভাষা যেমন শিখছে, প্রাচ্য সব ভাষাই শিখছে তেমনি করে। ভিয়েৎনাম, খ্‌মের, কাম্বোডীয়, জাপানী, কোরিয়ান, চীনা, জাভানী সব ভাষার চর্চা হচ্ছে। এখন এরা ভাষাগুলোকে আয়ত্ব করে নিচ্ছে।

বিকালে আমাদের যেতে হবে সুরেন্দ্র বালুপুরী নামে অনুবাদচক্রের এক সদস্যের বাসায়; সুরেন্দ্র শান্তিনিকেতনের ছাত্র। দ্বিবেদীর অনুরক্ত, তাই তাঁর বিশেষ অনুরোধ আমরা তাঁর বাসায় সন্ধ্যায় চা-এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। অবশ্য আমাদের দোভাষীদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। বাসা অনেক দূরে— অনেক ঘুরে বাসা পাওয়া গেল। চারতলার খাঁচার মধ্যে বাস। গিয়ে দেখি কয়েকজন হিন্দী, উর্দু অনুবাদক এসেছেন; শুভময়ও এল একটু পরে। বালুপুরী গৃহিণী সিঙাড়া, পকৌড়ি প্রভৃতি এবং আরও নানারকম খাদ্য বানিয়েছেন। লিডিয়া ভাবল, ভারতীয় সিঙাড়া খাবে। মুখে দিতেই তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেল। ঝাল! বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে, চোখ-মুখে জল দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। ঝাঁঝাল ভোদকা ঢক করে খায়— মুখে দিলে মাথা পর্যন্ত ঝাঁঝিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের লঙ্কা মরিচের ঝাল ও ঝাঁঝ হজম করা শক্ত!

লিডিয়ার সিঙাড়া খাওয়া দেখে অনেক দিন আগের একটা কাহিনী মনে পড়লো। আমার দাদা বহরমপুর কলেজে পড়েন— প্রিন্সিপালের প্রিয় পড়াশুনায় ভালো বলে। সাহেব একদিন কয়জন ছাত্রকে সকালে চা খেতে বলেছেন; ওলন্দাজী পনীর বা ডাচ্ চীজ ছিল খাদ্যের অন্যতম। চীজ দিয়ে রুটি সাহেব দিলেন খেতে; মুখে দিয়েই পেটের ভিতর কী রকম করে উঠলো। সাহেব শুধোয় কেমন লাগছে, ভালো তো? দাদা বলল— এক্সেলেন্ট— কিন্তু আর

টেবিলে বসে থাকতে পারলে না— বাথরুমে যেতেই চীজ-রুটি যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথ দিয়েই বের হয়ে এলো। লিডিয়াকে পরে গল্পটা বলি।

এখান থেকে আমরা চললাম Friendship Hall-এ। বিরাট বাড়িটা বিপ্লবের পূর্বে এক ধনী বণিকের সম্পত্তি ছিল। তারপর বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় আবর্জনার মত তারা সব উড়ে গেছে। সেই বাড়িতে স্টেজ, অডিটোরিয়াম, সভাগৃহ— কত। এখন এই অট্টালিকার ব্যবহার হচ্ছে মিলনমন্দির রূপে। সেই বাড়ির এক অংশে এক মেক্সিকান শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে— প্রথমে সেটা দেখতে গেলাম। আমরা যেদিন এসেছি— সেদিন একটা রেলওয়ে ক্লাবের সদস্যদের বিচিত্র-অনুষ্ঠান হবে। এরা রেলশ্রমিক— ইঞ্জিনিয়ার, টাইপিস্ট, ক্লার্ক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। তাদের ক্লাবে সদস্যরা যা করে, যা শেখে, তাই তারা দেখাচ্ছে। কতরকম প্রাদেশিক নাচ গান হল। প্রাদেশিক পোশাকও কত বিচিত্র। হাঙ্গেরিয়ান, চেক, বেলরুশীয় ও মধ্যএশিয়ার নাচ। ছোট মেয়েদের মুরগীর নাচ, হাসের নাচ অপূর্ব! জিমনাস্টিক যা একটি মেয়ে করল— তা যে কোন সার্কাসে দেখান যেতে পারে। মাথার উপর একটা জলভরা গ্লাস রেখে কি কসরৎই না দেখাল! কয়েকটা কবিতা, আবৃত্তি, গানও হল। একটা গানের কথা হচ্ছে— রাশিয়া কি যুদ্ধ চায়? রুশ ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে গানটা করলে একটি যুবক। বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা কর— তারা কি যুদ্ধ চায়, ভাইবোনকে জিজ্ঞাসা কর— তারা কি যুদ্ধ চায়, জিজ্ঞাসা কর তরুলতা, পশুপক্ষীকে— তারা কি যুদ্ধ চায়, ইত্যাদি। খুব আবেগ দিয়ে গাইল। অনুষ্ঠানের শেষে মস্কো সম্বন্ধে গান গাইল সকলে মিলে, শ্রোতা-দর্শকরা সে গানে যোগ দিল।

হল্ থেকে বের হয়ে আসছি এমন সময়ে একটি যুবক এসে প্রণাম করে বললে— সে বাঙালী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. পাশ করে Peoples Friendship University-তে (Lumumba) পড়ছে। সঙ্গে একটি মেয়ে, সিংহল দেশী— সে পড়ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনেছি— ছেলেটিকে দেখে ভাল লাগল, বললাম, লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরে তোমাদের ওখানে যেতে চেষ্টা করব।

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে উপরে আসতে দশটা বেজে গেল। বোরিস এলেন বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে। অনুবাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলল এগারটা পর্যন্ত। এত রাত্রে বোরিস ফিরবে বাসায় — সেও কাছে নয়। এদের শ্রমশক্তি দেখলে অবাক লাগে।

১৩

মস্কো

১৬ অক্টোবর ১৯৬২

আজ সকালে বের হলাম ত্রেতিয়াকভ (Tretyakov) চিত্রশালা দেখতে। প্যাভেল ত্রেতিয়াকভ নামে শিল্পপতি ছিলেন ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছবি সংগ্রহ ছিল তাঁর সৌখিনতা; যোদ্ধাও ছিলেন। ১৮৯২ সালে তিনি তাঁর সংগ্রহ মস্কো নগর-কর্তাদের হাতে সমর্পণ করে দেন। ১৯১৮ সালে যখন এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী আয়ত্তে আসে, তখন সেখানে ছিল মাত্র চার হাজার চিত্রাদি। আজ সেখানে বিবিধ কলা-নিদর্শনের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। এই গ্যালারিতে এগার শতক থেকে রুশীয় আর্ট বস্তুর নমুনা রয়েছে। রুশীয় চিত্রকরদের শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। আর্ট নিদর্শনের প্রায় লক্ষাধিক ফোটোনেগেটিভ ও ফেটোগ্রাফ আছে। প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ লোক এই চিত্রশালা দেখতে যায়। বিশেষ চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দেন বিশেষজ্ঞরা।

আমরা ঘরের পর ঘর ছবি দেখে চলেছি; কি ভিড়! আমরা ভ্রমণ-বিলাসীর চোখ নিয়ে ছবির উপর চোখ বুলিয়ে চলে যাচ্ছি; কিন্তু এক-একটা ছবির সামনে না দাঁড়িয়ে পারছিনে। সেরকম ছবি শিল্পীর শোণিত ঢেলে আঁকা— অর্থাৎ তুলি ও রঙের স্পর্শে শিল্পীর সমস্ত ব্যক্তিত্বটা ফুটে উঠেছে; ছবিতে হর্ষ, বিষাদ যেন মূর্ত হয়ে বের হয়ে আসছে। ইতিহাসের পাতা থেকে যাদের নাম মুছে গেছে, তারা শিল্পীর তুলিতে অমর হয়ে বেঁচে রয়েছে। মোনা লিসা কে ছিল, তা জানবার কৌতূহল যার থাকে থাক, কিন্তু তার মুখের

চাপা হাসি দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে রসিকরা আসছে। তাকে দেখবার জন্য আমেরিকানরা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের ছবি আঁকা হয়েছে--- যুদ্ধের বীভৎসতা দেখাবার জন্য। মানুষের বেদনা ফুটে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে। ত্রেতিয়াকভ চিত্রশিল্পী Repin-কে য়াসনা পোলিয়ানাতে পাঠিয়ে তলস্তয়ের যে প্রতিকৃতি করিয়ে আনেন— সেটা দেখলাম।

দুই ঘণ্টার উপর দেখলাম— কি দেখলাম তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে আর একখানা বই লিখতে হয়। দেখতে দেখতে এই কথা মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশে কি ত্রেতিয়াকভ হয় নি? হয়েছে বই কি—কিন্তু তারা যক্ষের ধন করে আগলে রেখেছিল। অযোগ্য বংশধররা সুবিধা পেলেই বিক্রয় করে দিয়েছে একে, ওকে, তাকে! পাটনার ইহুদী মানুক সাহেব যখন তাঁর বিরাট সংগ্রহ বিলাতে নিয়ে চলে গেলেন, তখন না পাবলিক, না গবর্নমেণ্ট সেটা রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। জালানের সংগ্রহালয় কি সরকারী আওতায় এসেছে? জানি না। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহ— একদিন অর্থাভাবে আমেদাবাদের ধনীর কাছে বিকিয়ে দিতে হয়— বাঙালী তাকে ঘরে রাখবার চেষ্টা করে নি; সে কথা ভুলতে পারিনে।

ত্রেতিয়াকভ গ্যালারিতে যে সব ছবি সংগৃহীত হয়েছে তা ক্ল্যাসিকাল পদ্ধতিতে আঁকা; অর্থাৎ আধুনিক কালের চিত্রবিকৃতির সংগ্রহ এখানে নেই। সোভিয়েতরা বাস্তববাদী— তারা সাহিত্যকে আর্টকে 'কাজে'র জন্য ব্যবহার করতে চায়। স্তালিনের সময় তো সাহিত্যিক শিল্পী আপন মনের রঙে ও রসে কিছু রচনা করতে পেতেন না। কম্যুনিস্ট পার্টির মুরুব্বিরা এসবও নিয়ন্ত্রণ করতেন। তার ঢেউ বহুকাল চলে; তা না হলে পাস্তারনেকের বইখানা নিয়ে এত কাদা কেন ঘুলিয়ে উঠল। কিন্তু কালবদলের হাওয়ায়

সোভিয়েত দেশের সাহিত্যে ও শিল্পে স্রষ্টার মনের কথা প্রকাশ পাচ্ছে— পার্টির নির্দেশ মেনে চলছে না নবীন ভাবুকরা। ক্রুশ্চেভের আর্টবোধ খুবই চাঁচাছোলা সাধারণ— তাই আধুনিক আর্টকে গাধার লেজের ঝাপ্টানি বলে ব্যঙ্গ করেছেন। উপমাটা ক্রুশ্চেভের উপযুক্ত হয়েছে— কারণ, তিনি সোজা কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কথার চাতুরী তাঁর নেই। কিন্তু আজকাল যে সব ছবি আধুনিক আর্টের নামে বাজারে আসছে— সে-সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে পুথি বেড়ে যাবে। মোট কথা সোভিয়েত রুশেও সে হাওয়া এসে গেছে— একথা ভুললে চলবে কেন— দুনিয়াটা এক হয়ে গেছে, the world is one। লৌহ-কপাট টেনে দিলে contagion বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু হাওয়ায়-চলা infection রুখতে পারা যায় না। ভাবের আনাগোনা আজকের দুনিয়ায় বন্ধ করতে যাওয়া ব্যাকুলতা।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হয়ে পড়লাম লেনিন গ্রন্থাগার দেখবার জন্য। এই লাইব্রেরী মস্কোর কেন, পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থাগার। ক্রেমলীনের সামনে এই অট্টালিকার পাশ দিয়ে বহুবার গিয়েছি— তার স্থাপত্য, তার সুন্দর কঠোর পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল। ১৮৬২ সালে এর পত্তন হলেও সোভিয়েত রুশ পাকা হয়ে বসবার আগে পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে বই-এর সংখ্যা ছিল বার লক্ষ ; তারপর বিপ্লবের পর গত কয় বছরের মধ্যে গ্রন্থাদির সংখ্যা হয়েছে দুই কোটি বিশ লক্ষ। এই বাড়িতে বাইশটি পড়বার ঘর, প্রায় আড়াই হাজার পাঠকের পড়বার জায়গা আছে। বই রাখা আছে আঠার তলা বাড়িতে। কলে বই আসছে ডেলিভারি টেবিলে। আমেরিকার লাইব্রেরী অব কনগ্রেসের চলচ্চিত্রে এ সব দেখা। আজ চর্মচক্ষে

সেটা দেখলাম এখানে। এই লাইব্রেরীতে উননব্বুইটি সোভিয়েত ভাষার আর বিদেশী চুরাশিটি ভাষার বই পত্রিকা আসে। বার হাজার পত্রিকা, এক হাজার খবরের কাগজ। দশ লক্ষ করে বই জমা হচ্ছে প্রতি বৎসর। এই সব জিনিষ গোছানো, তালিকা করা, কার্ড করা প্রভৃতি কাজ করার জন্য বহুলোক নিয়োজিত। বিজ্ঞানী গবেষকদের অফুরন্ত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। রেস্তরাঁতে ঢুকেই খানা চাই—রান্না করে খাবার সময় কই? সময় নেই— তথা এখনি চাই। অসংখ্য প্রশ্ন আসছে, দ্রুত তার উত্তর পাঠাতে হবে। আমরা পৌঁছলে একজন মহিলা আমাদের নিয়ে চললেন ডিরেক্টরের ঘরে। প্রধান নেই, তাঁর সহকারী বা সহকারিণী আমাদের স্বাগত করলেন, লেনিন লাইব্রেরীর ব্যাজ জামায় এঁটে দিলেন। কয়েকখানা করে বই উপহার দিলেন। তার মধ্যে ছিল বাংলায় তলস্তয়ের তর্জমা কসাক ও গল্পের বই। ভারত সরকার ও সাহিত্য আকাদামির পক্ষ থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিষ ও বই উপহার দেওয়া হল। আমি বহুকাল গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে এঁদের বর্গীকরণ পদ্ধতি কি জানতে চাইলাম। বুঝলাম, ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ পুরাপুরি চলিত হয় নি ; Cutter ও Brown-এর পদ্ধতি রুশীয় করে নেওয়া হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যা বর্গীকরণ সম্বন্ধে বই কয়েক খণ্ড আমাকে পরে পাঠিয়ে দেয়।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুরলাম, দেখলাম। পুঁথিবিভাগ, মাইক্রোফিল্ম বিভাগ প্রভৃতি দেখলাম। মাইক্রোফিল্মের বিরাট আয়োজন— বহু দুষ্প্রাপ্য বই ফিল্ম তুলে রাখা হচ্ছে। প্রেমচাঁদের একটা প্রথম ছাপা বই-এর ফিল্ম আমাদের দেখালেন। বইটার একটা কপি মাত্র আছে, টানাটানিতে দশম দশা যাতে প্রাপ্ত না হয়

তজ্জন্য ফিল্মে তোলা হয়েছে। কলের তলায় ফেলে বড় বড় হরফ পড়তে খুবই সুবিধা। অন্ধকার ঘরে অনেকেই মাইক্রোফিল্ম নিয়ে কাজ করেছেন দেখলাম।

হোটেলে ফিরলাম। আজ রাতে লেনিনগ্রাদ যাত্রা করতে হবে। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। হাতে সময় আছে। সন্ধ্যার পর একটা সিনেমায় যাওয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গল্প নিয়ে নাটক। একটি যুবক রুশ পাইলট যুদ্ধে যাবার আগে একটি মেয়েকে ভালবাসে। যুদ্ধ শুরু হল। ট্রেনে করে সৈনিকরা যাচ্ছে, স্টেশনে আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে, উৎসাহ দিচ্ছে, প্রাণপণে চিৎকার করছে যদি শুনতে পায়। কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। ট্রেনের পর ট্রেন চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় খবর এল, সেই পাইলট মারা গেছে। এদিকে মেয়েটির একটি ছেলে হয়েছে। নিজের বাড়িতে থাকে, যুদ্ধের জন্য ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। ইতিমধ্যে তার দিদি এল ঐ বাড়িতে থাকতে স্বামীর সঙ্গে। স্বামীটি বর্বর। শ্যালীকে নির্যাতন করে, অপমান করে তাদের বিবাহ চার্চে সিদ্ধ হয়নি বলে। মেয়েটির কাছে আসে তার বাল্যবন্ধু— একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিল তারা। সে এখনও মিলিটারিতে কাজ করে— থাকে আর্কটিক সাগরের দিকে। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি পাইলটকে ভুলতে পারছে না। শিশু ছেলেটি বন্ধুকে দেখে 'বাবা' বলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটা অসহ্য হল মায়ের, সে কিছুতেই সেটা শুনতে চায় না, ছেলেকে তার কোল থেকে কেড়ে নিল। বন্ধু চলে গেল উত্তর মহাসাগর তীরে। দিদির এক প্রেমাস্পদ ছিল, সে পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়েছে, বই লিখেছে। দিদি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর ঐ বর্বর লোকটিকে বিয়ে করেছিল টাকার লোভে। দিদিকে দেখতে পেয়ে সেই পণ্ডিত

ছেলেটি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। দিদি কাঁদে। পাইলট যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে। কিন্তু পার্টি তাকে নিচ্ছে না। সে জার্মানদের বন্দী ছিল ; নিশ্চয়ই নাৎসী মতাবলম্বী হয়ে এসেছে। অত্যন্ত কষ্টে দিন যায় ; মদ খেয়ে শরীরপাত করে। মেয়েটি তাকে খুঁজে বের করে আনে। পার্টির কাছে গেল, কিন্তু পার্টিকর্তা কিছুতেই তাদের কথা শুনলেন না। এমন সময়ে কাগজে খবর বের হল স্তালিনের মৃত্যু হয়েছে। কী যেন একটা আনন্দ সংবাদ। মেয়েটি বললে—'চল মস্কো। সেখানে পার্টির কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলব।' পার্টির লোকেরা সব বুঝে পাইলটকে সগৌরবে গ্রহণ করলে। এবং তাকে বিজয়ীর সম্মান দিল।

আসলে কাহিনীটি স্তালিন পর্বের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করার জন্য রচিত। ছবি হিসাবে সুন্দর— ফোটোগ্রাফী দেখবার মতো।

সিনেমা দেখে হোটেলে ফিরলাম। সেরাব্রকভ, বোরিস, লিডিয়া আমরা একসঙ্গে খেলাম। অনেকক্ষণ বসে গল্প হাসি তামাশায় সময় কাটল। আজ রাত্রেই লেনিনগ্রাদ চলেছি।

হোটেল থেকে বের হলাম এগারটার পর। অনেকেই সঙ্গে চললেন স্টেশনে। লম্বা প্ল্যাটফর্ম— অনেকখানি হেঁটে আমাদের এক্সপ্রেস্ ট্রেন পেলাম। ছয় নম্বর গাড়ি। রুশ রেলওয়েতে এই প্রথম উঠলাম। নীচে উপরে চারটা বার্থ। আমরা তিনজন আর একজন রুশ— এস্তোনিয়ার তালিনিন শহরে যাবেন। জানলায় ডবল কাঁচ— বোধ হয় ঘর গরমের ব্যবস্থা আছে। কাঁচের ভিতর থেকে লিডিয়াদের দেখা গেল। এগারটা পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

তালিনিন যাত্রী যুবকটিকে কৃপালানী সিগারেট দিলেন ; ভারি খুশি। নির্বাক আমরা— কেউ কারো ভাষা বুঝি না। মনে পড়ছে

অনেক কালের কথা, যখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাল্টিক সাগর তীরের লাতবিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি জারের সাম্রাজ্য ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, আবার বিশ বছর পরে স্তালিন তাদের সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য করে নিলেন— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

ভদ্রলোকটি আপনার মঞ্চে উঠে শুলেন। আমরাও শুয়ে পড়লাম। সুন্দর বিছানা, বালিশ, কম্বল। বাথরুমটা প্যাসেজের প্রান্তে— এই যা অসুবিধা, তবে আজকাল আমাদের দেশেও কতকগুলি ফার্স্ট ক্লাসে এই রকম হয়েছে। কামরার মধ্যে রেডিও বাজছে— মাঝে একটা হিন্দী গানও কানে গেল। ট্রেনে চাপা শব্দ ছাড়া আর কিছু উপভোগ্য ছিল না; এক্সপ্রেস, থামছে না কোন স্টেশনে— কেবল অস্পষ্ট আলোকছটা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা যাচ্ছে। তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৪

লেনিনগ্রাদ

১৭ অক্টোবর ১৯৬২

ট্রেনে চলেছি। ভোর হতেই লেবু-চা দিয়ে গেল এক মহিলা। ট্রেনেই ব্যবস্থা আছে। তিন কোপেক করে দিতে হল। আকাশ ফরসা হতেই বাইরে চেয়ে দেখি তুষারে সব সাদা হয়ে আছে। এ দৃশ্য কখনও দেখি নি, বাড়ির ঢালু ছাদ, গাছের পাতা, রাস্তা— সব যেন চুনকাম করা হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখছি— জনহীন স্টেশন চলে যাচ্ছে— মাঠের পর মাঠ— গ্রামের পর গ্রাম! এক্সপ্রেস থামছে না কোথাও। প্রায় সাড়ে আটটায় লেনিনগ্রাদ স্টেশনে পৌঁছলাম।

আমরা যখন ছোটবেলায় স্কুলে পড়ি, তখন জানতাম, রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম সেণ্ট পিটার্সবার্গ। এটা রুশিয়ার রাজধানী ছিল ১৭১৩ থেকে ১৯১৮ অর্থাৎ পিটার (১৬৮৯-১৭২৫) থেকে শেষ সম্রাট নিকোলাসের সময় পর্যন্ত। যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সাধু পিটারের নামে শহর পত্তন করেন জার পিটার ; সাধু পিটারের নামে উৎসর্গ করা চার্চ আছে। সম্রাট পিটার বর্তমান লেনিনগ্রাদ থেকে মাইল ষোল দূরে পিটার হোফ (এখন নাম Petrodvortes) নামে বিরাট এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন— সেটা প্রায় বাল্টিক সাগরের শাখা ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের কাছে। সুইডেনকে হারিয়ে রুশিয়া তার ইজ্জত পায় যোদ্ধ য়ুরোপ মহলে। সেই ইজ্জত দেখাবার জন্য সুলভ দাস শ্রম দিয়ে এই প্রাসাদ নগরী নির্মিত হল। তখনকার দিনে য়ুরোপের বনিয়াদী রাজা মহারাজরা রুশীয়দের সভ্যজাত বলেই মনে করতেন না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা

নয়। উনবিংশ শতকে কোন রুশ বড় লোকের বাড়িতে অতিথি আসলে, তাঁকে শোবার জন্য বিছানা দেবার পূর্বে সার্ফ (দাস)-দের সেই বিছানায় শুতে হত। বিছানার ছারপোকারা পেট ভরে খেয়ে চলে গেলে, অতিথি শুতে আসতেন। এ কাহিনী তলস্তয়ের জীবনীতে পড়ি।— আমাদের দেশে 'খাটমল' বা ছারপোকাকে দেহের রক্তদান পুণ্য কর্ম।

পিটার রাজা হয়ে রুশদের সভ্য করবার জন্য অনেক মেহনত করেন; সে ইতিহাস বলতে গেলে মহাভারত রচনা করতে হয়।— মোট কথা, সমুদ্রের দিকে একটু জানলা খোলবার জন্য বাল্টিকের উপসাগর তীরে রাজধানী পত্তন করেন। নেভা নদীর মোহানায় গড়ে উঠল নগর— এখানে সেখানে। আজ সেই নেভা নদীর উপর প্রায় ৭০০ সেতু; পাশ ফিরলেই নেভার শাখা— প্রধান সড়কের নাম নেভাস্কিয়া।

সেন্ট পিটার্সবার্গ শব্দের 'বার্গ' শব্দটা জার্মান; তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান যখন 'দুশমন' হয়ে উঠল— তখন নগরের নাম পাল্টে পেত্রোগ্রাদ করা হল; পিটার হোফ্-এর হোফ্ শব্দটা জার্মান; সেটা নাকচ করে হ'ল Petrodvortes, খাঁটি রুশ শব্দ। পেত্রোগাদ নাম চলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে— তার পর মহানগরীর নাম হয় লেনিনগ্রাদ। তাঁর জীবনকালে কোনও শহরের নাম তাঁর নামে হয় নি। কিন্তু স্তালিনের নামের নেশা ও শক্তির নেশা সমান ছিল তাই উনিশটা শহর নাকি তাঁর নাম পেয়েছিল; এমন কি উচ্চতম গিরিশৃঙ্গেরও নামকরণ হয়েছিল স্তালিন পিক। এখন সারা সোভিয়েত দেশে স্তালিনের নাম কোথাও আর নাই; এমন কি ইতিহাসবিখ্যাত স্তালিনগ্রাদ— তারও নাম বদলে হয়েছে ভল্গোগ্রাদ।

লেনিনগ্রাদ স্টেশনে পৌঁছে দেখি দুইজন ভদ্রলোক আমাদের স্বাগত করতে এসেছেন। একজনের নাম বারনিকফ অপরের নাম কালিনিন— উভয়ে অ্যাকাডেমির কর্মী-সদস্য। আমরা এখানেও অ্যাকাডেমির অতিথি।

মস্কো থেকে এখানে বেশি ঠাণ্ডা। তুষার পড়েছিল রাত্রে, এখনও ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বেগে। এমন ঠাণ্ডা ইতিপূর্বে পাইনি মস্কোতে। মোটরকারের মধ্যে উঠে বাঁচলাম। হোটেল আস্তোরিয়া— এই মহানগরের সেরা হোটেল। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। চার তলায় স্থান হল সবারই। এমন সময়ে শুনলাম নীচে নোবিকোভা এসেছেন। দেখা করতে গেলাম। এঁকে ভাল করে চিনি— শান্তিনিকেতনে এসেছেন, আমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন। গত বৎসর সাহিত্য আকাদেমির আয়োজিত রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আহূত সম্মেলনেও এসেছিলেন। পত্র বিনিময়ও হয়েছে। ভাল বাঙলা জানেন এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে তর্জমা হচ্ছে, তার একজন বিশিষ্ট অনুবাদক-কর্মী। দেখা হলে বললেন, 'আমাকে ভুল ট্রেন-এর কথা বলা হয়েছিল, স্টেশনে গিয়ে আপনাদের দেখতে পেলাম না ; তাই এখানে দেখা করতে এলাম'। স্থির হল একদিন য়ুনিভার্সিটিতে তাঁদের বিভাগে যেতে হবে এবং একদিন তাঁর বাড়িতে ভোজন করতে হবে। বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না— অনেক দূরে বাড়ি ; তার পর আবার য়ুনিভার্সিটিতে যেতে হবে। নোবিকোভাকে ভুল সময় বলা হয়েছিল, কথাটা শুনে একটু খটকা লাগল !

প্রাতরাশ সমাধা করে আমরা বের হলাম অ্যাকাডেমির গাড়িতে। সঙ্গে বারানিকফ ও একজন মহিলা ফোটোগ্রাফার, মহিলা জার্মান ছিলেন, এখন রুশী হয়েছেন। বারানিকফ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য,

অ্যাকাডেমির হিন্দী বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী। এঁর পিতা বারানিকফ নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন; তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া হিন্দী সম্পর্কে বহু কাজ করেছিলেন। তুলসীদাসের অনুবাদ রুশ ভাষায় হয়েছে শুনেই আজ আমরা যতটা বিস্ময় প্রকাশ করি, ঊনবিংশ শতকের আট দশকে Growse যখন রামচরিতমানস ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছিলেন, ততটা বিস্ময় প্রকাশ করি নি। কারণ, তখন ইংরেজ এদেশের প্রভু, তাদের পক্ষে ভারত সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা স্বাভাবিক বলেই ভাবতাম। কিন্তু রুশীয়দের? তাদের কী গরজ ভারতের সংস্কৃতি জানবার জন্য? রুশরা জানে, মিষ্টি কথায় যত কাজ হয়, ঠেঙ্গানি দিয়ে তা হয় না। বিদেশীর মুখে বাঙলা, হিন্দী শুনলে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। তবে কুটিল লোক বলে, এসব হচ্ছে প্রোপাগাণ্ডার একটা পথ, ওরা মন জয় করতে চায়। প্রোপাগাণ্ডার কথাটা বাদ দিলে হয় না? কেউ-বা গম ধার দিয়ে, কেউ-বা গুঁড়ো দুধ পাঠিয়ে আর কেউ-বা বই পাঠিয়ে মন জয় করতে চায়! বিদেশীর ভিক্ষা পাওয়া খাদ্য পেলে পেট ভরে; আবার বিদেশী বই পড়লে মনটা ভরে তাদেরই বুলিতে। পেটে খাওয়া গমটা হজম হয়; কিন্তু পরের ধার করা বুলি? রেকর্ড খুলে দিলে সেই সব বুলি ঝরঝরিয়ে এসে পড়ে। ধার করা অন্যের কথা হজম করতে পারলে কাজে লাগতো, নিজস্ব রূপ পেতো। মুশকিল হয়েছে, আমাদের পেট যেমন দুর্বল— মনও তেমনি হালকা, তাই হালকা জায়গা ভরে ওঠে অন্যের ধার করা বুলিতে। শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ,

'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি।
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখীন মজদুরি।'

মোটরে চলেছি, লেনিনগ্রাদের ভিজে পথের উপর দিয়ে, নিঃশব্দে তুষার পড়ছে ঝিরঝিরিয়ে পেঁজা-তুলোর মতো! বারানিকফ্ আমাদের নিয়ে চলছেন Field of Mars-এ— সহরের একপ্রান্তে তুষার ঢাকা বিশাল সমাধি ক্ষেত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর ফ্যুরার হিটলার লেনিনগ্রাদ আক্রমণ করেন। রুশকে পরাভূত করবার স্বপ্ন নিয়ে নেপোলিয়ন দেড় শ' বৎসর পূর্বে মস্কো আক্রমণ করেছিলেন; আজ হিটলারও সেই ভুলটি করলেন রুশকে আক্রমণ করতে গিয়ে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লেনিনগ্রাদকে ডাঙা থেকে গোলা দিয়ে ও আকাশ থেকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবেন। তারপর হোটেল আস্তোরিয়ায় বড়দিনের সময় এসে উৎসব করবেন; তার জন্য ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছিলেন সেনানায়কদের। হিটলারের সৈন্যবাহিনী মহানগরীকে চারদিক থেকে বেড়াজালে ঘিরে ছিল দশ মাসের উপর— কোনো দিক থেকে খাদ্য রসদ কিছুই আসে না; অনাহারে ও ব্যাধিতে ছয় লক্ষ লোক মারা গেল। একটি মেয়ের হাতের লেখা খাতা পাওয়া গেছে; সে তাতে লিখেছে, তাদের বাড়ির কে কবে মারা গেলেন একের পর একে। কিন্তু লেনিনগ্রাদবাসীরা দমলো না; ল্যাডোগা হ্রদ দিয়ে যে ক্ষীণ সংযোগ ছিল সেটা রক্ষা করে বাইরে থেকে রসদ পত্র আনতে থাকে। লেনিনগ্রাদ কারিগরী কাজের জন্য বহুকাল বিখ্যাত। সমস্ত লোক দিনরাত খেটে গোলাগুলি প্রস্তুত করে লড়তে লাগল। যুদ্ধেও লক্ষাধিক লোক মারা পড়ল। এত ত্যাগ, এত বেদনা বোধহয় কোনো নগরবাসীদের করতে হয় নি। লেনিনগ্রাদ রক্ষার সিনেমা আমাদের দেখানো হয়। শহরের মধ্যে বোমা পড়ে কত জায়গা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আজ তার চিহ্ন নেই, নূতন করে সব গড়া হয়েছে।

এই নরমেধ যজ্ঞের অগ্নি এখনো রুশীয়রা জ্বালিয়ে রেখেছে এই

সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশ মুখে। একটি জায়গায় রাতদিন গ্যাসের আগুন জ্বলছে। আজ সমস্ত সমাধিক্ষেত্র তুষারাবৃত। বসন্তকালের ফুলের সৌন্দর্য এখানে দেখতে পেলাম না— ছবিতে দেখেছি সেটা।

নিকটেই একটা ম্যুজিয়াম। সেখানে গেলাম। যুদ্ধের ইতিহাস ও বীরদের আত্মকাহিনী শুনলাম। আমাদের সঙ্গে যে মহিলা অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে আছেন, তিনি অনেকগুলি ফোটো তুললেন, আমি কতকগুলি ছবি কার্ড কিনলাম যার মধ্যে এখানকার ইতিহাস ছাপা হয়ে আছে। বুঝলাম দুশমনরা জয়ী হয় না। নেপোলিয়ন ও হিটলার এই শ্রেণীর পাপী— পরস্বাপহরণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের করতে হয়। তাই উপনিষদ বলেছেন 'মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্'। গৃধ্নুতা বা acquisitiveness হচ্ছে ধনবানদের ধর্ম ; আর বণ্টন করে ভোগ ক'রে নেওয়া হচ্ছে ধনহীনদের কর্ম। দুনিয়াভর এই টানাটানি চলছে সর্বহরা ও সর্বহারাদের মধ্যে। কখনো প্রজার মুণ্ড গড়াগড়ি যায় রাস্তায়— কখনো রাজার মুণ্ড জল্লাদের খাঁড়ায় ছিন্ন হয়ে পড়ে। হারজিতের মীমাংসা কোনো কালে হয় নি— কেবলই দেখা যায়, কখনো 'লা পরে ঘোড়া, কখনো ঘোড়া পরে লা' : নাগরদোলায় ওঠাপড়া চলছে চিরকাল। যেদিন পৃথিবীটা 'সব পেয়েছির দেশ' হবে তখন এটা বাসের অনুপযুক্ত হবে।

সমাধিক্ষেত্র থেকে বার্চ্‌বনের মধ্যে তুষারের উপর দাঁড়িয়ে ফোটো নেওয়া হল। তুষারের উপর হাঁটার অভিজ্ঞতা হল— পায়ের তলায় মচমচ করছে বরফ ; ওভারকোটে, দাড়িতে জমে উঠছে তুষারকণা। জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা!

পথে নেভা নদীর ধারে গাড়ি থামল। নদীতে একটা স্টীমার। বারানিকফ বললেন— এটা হচ্ছে 'অরোরা'— যে জাহাজ থেকে বিপ্লবের প্রথম গোলা ছোঁড়া হয়। জাহাজখানা সযত্নে রাখা আছে।

১৯১৭ সালের 'অক্টোবর বিপ্লব' শুরু হয় সেদিন— পুরানো পঞ্জিকা মতে মাসটা অক্টোবর ছিল— কিন্তু রুশের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে 'নভেম্বর ৭' হচ্ছে বিপ্লবারম্ভের শুভদিন— প্রতিবৎসর পালিত হয়।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে আবার বের হলাম। এবার চলেছি অ্যাকাডেমিতে--যাঁর অতিথি হয়ে আমরা এসেছি এদেশে। লেনিনগ্রাদেই অ্যাকাডেমি আগে ছিল--- এখন কাজের ভাগ হয়ে গেছে মস্কোর সঙ্গে।

নেভা নদীর তীরে বিরাট বাড়ি— জার নিকোলাসের কোন ভাইয়ের বাড়ি ছিল। বড় বড় ঘর। নাচঘরটা লাইব্রেরী হয়েছে। পুঁথির সংগ্রহ দেখলাম। বেশ যত্ন করে সব রাখা আছে; তবে এ বাড়িতে আর সঙ্কুলান হচ্ছে না শুনলাম।

আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসলাম; একজন যুবক সদস্য সেখানকার এই বিভাগের কাজের কথা বললেন— কালিনিন নামে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রুশভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করছেন— একখণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। এক তরুণী বনপর্ব তর্জমা করছেন। কলকাতা, পুণার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মহাভারত নিয়ে কাজ হচ্ছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হরিদাস সিদ্ধান্তের মহাভারতের কথা এরা জানে না দেখলাম। আমি বললাম, নীলকণ্ঠ যে সব স্থলে আন্দাজে অর্থ করেছেন, হরিদাস সিদ্ধান্ত সে সব জায়গায় আলোকপাত করেছেন। আরও বললাম সোরেনসেনের মহাভারতের সূচীর কথা; এ বই-এর খবরও এঁদের জানা ছিল না। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারত সম্বন্ধে যে কাজ করেছেন তার কথাও জানিয়ে দিলাম। মস্কোতে যেমন দেখেছিলাম— এখানেও এক দল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন।

একটি তরুণী চতুরঙ্গের রুশ অনুবাদ করেছেন, আমাকে উপহার

দিলেন। দুঃখ করে তিনি বললেন, লেনিনগ্রাদে আমার লেখা 'রবীন্দ্রজীবনী' পান নি, মস্কোয় যখন গিয়েছিলেন, তখন সেখানে লেনিন লাইব্রেরীতে বই দেখে আসেন ও নোট করে আনেন। এখানে নোবিকোভার নিজস্ব লাইব্রেরীতে 'রবীন্দ্রজীবনী' আছে।

অ্যাকাডেমি থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বারানিকফ বললেন, 'সাদি ঘর' দেখবেন? ব্যাপারটা কি? বললেন, এই সামনের বাড়িতে বিবাহ হয়, চলুন দেখে আসি। বিশাল বাড়ি, মর্মর পাথরের সিঁড়ি; থামগুলিতে অশেষ কারুকার্য করা। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। নেভা নদী সামনে প্রবাহিত। ওপারে দুর্গের চার্চ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে— সেন্ট পীটারের চার্চ— যাঁর নামে এই মহানগরীর নামকরণ হয় একদিন। চিরকালই সমকালীন বীর বা মহাপুরুষদের নামে নগরের নামকরণ হতো— আলেকজেন্দ্রিয়া, আন্টিয়োকাস ক্যারোলিনা— অগণিত নাম করা যেতে পারে! সাধুসন্তদের নামেও শহর পত্তন হতো— তার প্রমাণ সেন্ট পীটার্সবার্গ। কালবদলের হাওয়ায় নূতন মানুষের নামে শহর, বন্দর পত্তন হচ্ছে— সকলদেশেই। লেনিনের নামে লেনিনগ্রাদ হলো— স্তালিন তাঁর গদিতে বসে প্রায় দেড় ডজন স্থানের নাম দিলেন নিজের নামের সঙ্গে যোগ দিয়ে। 'সাদি ঘর' ছিল কোন এক ধনীর প্রাসাদ— এখন তারা নিশ্চিহ্ন। সোবিয়েত দেশে নূতন ধনী হয়ত হচ্ছে— তবে তারা সরকারী লোক— পার্টির দয়ায় উঠছে এবং হয়তো পার্টির কোপেই একদিন পুড়ে মরবে! টাকা জমাতে পারে, ব্যাঙ্কেও রাখতে পারে, সুদও পায়— সামন্য হলেও। টাকা জমিয়ে মোটর গাড়ি কিনতে পায় এবং বাড়ি বানাতে পারে শহরতলীতে। ভোগের স্পৃহা সকলেরই আছে, তবে তা পাঁচ জনের মধ্যে বণ্টন করে ভোগ করতে হয় বলে লোভটাকে সংযত করতে হয়েছে। এই লোভটাকে

দমন ক'রে রাখতে গিয়ে তারা দেখেছে, শুধু ধর্ম উপদেশে কাজ হয় না— বাস্তববোধ আছে বলে 'দণ্ডে'র ব্যবহার তারা করে, দণ্ডবিধির হাজার ফাঁক দিয়ে অপরাধী ফুকলে পালাতে পারে না। হাজার টাকার জামিন জমা দিয়ে আসামী ফেরার হওয়া শক্ত সে-দেশে!

বিবাহ ঘরে গেলাম দোতলায়। লেনিনের মূর্তি দেওয়ালে— তার উপরে কম্যুনিস্ট প্রতীক আঁকা। একটা টেবিলের পাশে তিন-জন মহিলা বসে। ঘরের দেওয়ালের ধারে ধারে চেয়ারে আমরা বসলাম। একজোড়া দম্পতি এলেন— সঙ্গে কয়েকজন করে লোক, মনে হ'ল দুই পক্ষের বন্ধুবান্ধব। টেবিলের পাশে বসা মহিলাদের মধ্যে একজন রুশ ভাষায় কি বললেন, দম্পতিরা একটা খাতায় সই করল, সরকারী পক্ষ থেকে ফোটো তোলা হ'ল। অবশ্য আত্মীয়রাও ফোটো নিলেন। বিবাহ হয়ে গেল, সকলে বরকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল, আমরাও গেলাম ও করমর্দন করে আশীর্বাদ করলাম। রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে বিবাহপর্ব শেষ— তারপর হোটেলে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খানাপিনা, নাচগান হবে। এ বিবাহ হল খাঁটি সোভিয়েত মতানুসারে। তবে খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ধর্মসম্মত বিবাহ ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি চার্চে গিয়ে বিবাহ করে, বা মোল্লা ডেকে শরিয়াৎ অনুসারে আরবী মন্ত্র পড়ে নিকা করে তবেও কেউ আপত্তি করে না। ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও উদাসীন। তবে লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত কাজান ক্যাথিড্রাল এখন সায়েন্স অ্যাকাডেমির নাস্তিক্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কীয় ম্যুজিয়াম। এই প্রাক্তন ধর্মগৃহে এখন আর ভক্ত আর ভণ্ডদের আনাগোনা চলে না, এখন নূতন যুগের মানুষ তৈরি করবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

ধর্মনিরপেক্ষ কোনো-কোনো আধুনিক দেশে পুলিশের কোন্ বড়কর্তা কোথাকার মন্দিরে বা বিশেষ কোন্ ধর্মসভায় কিভাবে

খোল বাজিয়েছেন অথবা কোন রাষ্ট্রের কোন্ মন্ত্রী কীর্তনের সঙ্গে বাহু উত্তোলন করে কিভাবে নৃত্য করেছেন বা কোন্ মুখ্যমন্ত্রী ইদ্‌গায় হাজির হয়েছেন ইত্যাদি খবর সেদেশের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। কোনো সভ্যদেশে পদবীর সঙ্গে ব্যক্তির নাম জড়িয়ে ধর্মসভার বিজ্ঞাপন হয় না— তবে যারা বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলে মানে— তাদের কথা ধরি না, কারণ তারা কোদালকে কোদালই বলে— call a spade a spade— কোদালকে নরুন বলে না। এ-ও সত্য, অ-ও সত্য বলে দুকূল বাঁচাবার চেষ্টা যারা করেন, তাঁদের শেষ পর্যন্ত একূল-ওকূল দুকূলই যায়। ইতোনষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ— সত্যের সঙ্গে চোখ টিপাটিপি চলে না!

সন্ধ্যার পর একটা কিছু করতে হবে বলেছিলাম বারানিকফকে। তাই সার্কাস দেখতে গেলাম। একটা স্থায়ী গৃহে ব্যবস্থা আছে সার্কাসের। সার্কাসে বসবার ভাল জায়গা পেয়েছিলাম ; এখানে আর ওভারকোট খুলতে হয় না, কারণ কেন্দ্রীয় তাপের ব্যবস্থা এখানে তো নেই। মানুষের দুর্জয় সাহস ও শক্তির পরিচয় পাই, যখনই সার্কাস দেখি। জন্তুর মধ্যে ছিল কুকুর, ঘোড়া ও ভালুক। কুকুরটাই সব থেকে বাহাদুর দেখলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে, ভারতের সার্কাস কোন অংশে বিদেশী সার্কাস থেকে ন্যূন নয়। অনেক ক্ষেত্রে আগিয়েও আছে। অল্পদিন পূর্বে বোলপুরে ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাস এসেছিল, আমার সঙ্গে রুশ মহিলা মিসেস বিকোবা দেখতে যান। তিনিও মুগ্ধ হয়ে বলেন যে, ভারতীয় সার্কাস কোন কোন ক্ষেত্রে রুশ সার্কাস থেকে ভাল। পশ্চাত্ত্য সার্কাসের আলোকসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রাদির সাহায্যে বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রভৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

সার্কাসের মাঝখানে লাউঞ্জে গেলাম। সকলেই আইসক্রীম

খাচ্ছে; সে আইসক্রীম কাগজে মোড়া নয়, রুটির মত পদার্থ দিয়ে ঢাকা। সেটা-সুদ্ধ খেতে হয়। আমাদের ভারতীয় অভ্যাসমতে এক টুকরা কাগজ মেঝের উপর ফেলেছিলাম। বন্ধু বারানিকফ্ দেখিয়ে দিলেন কোথায় ফালতু কাগজ ফেলতে হবে। অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলাম; কারণ আমার স্বভাবের বিপরীতই করেছিলাম আধারটা চোখে পড়ে নি বলে। আমার সঙ্গীরা নিতান্ত আমার খাতিরে সার্কাস দেখতে এসেছিলেন— মনে হল একজন ঘুমিয়েও নিলেন।

১৫

লেনিনগ্রাদ

১৮ অক্টোবর ১৯৬২

গতকাল সার্কাস দেখে ফিরে খেতে শুতে বেশ দেরি হয়ে যায়। তাই আজ সকালে উঠতে দেরি হল। স্নান হয় নি গতকাল ট্রেন থেকে নেমে। আজ খুব ভাল করে স্নান করলাম। এখানেও বিরাট বাথটব, ঠাণ্ডা গরম দুই জলই পর্যাপ্ত। উপর থেকে ঝর্ণা নেই, তবে নল লাগানো স্প্রে আছে; চামড়ার উপর তীব্রবেগে ছুঁচের মত ফোটে। বেশ আরাম হল। ঘরে বসবার ফার্নিচার আরামের-চেয়ার, সোফা, লেখবার টেবিল, দোয়াত কলম, কাগজ সব রয়েছে। শোয়ার জায়গাটা একটু আড়ালে— পর্দা আছে— টেনে দেওয়া যায়। যথারীতি টেবিলে বসে লেখাপড়া একটু করে নিলাম। মস্কো হোটেল থেকে এখানকার হোটেল অধিক অভিজাত— সেকথা জোর করেই বলা যায়।

প্রাতরাশের সময় হল। নীচে নেমে গেলাম। ব্রেকফাস্ট করে উঠতেই দেখি বারানিকফ এসে হাজির। আমরা এবার চলেছি একটা মধ্যস্কুল দেখতে। পথে আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে বারানিকফের স্ত্রীকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, হিন্দী পড়ান। বারানিকফ ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন, উভয়ে হিন্দীর ছাত্রছাত্রী: তাই প্রণয় থেকে পরিণয় হয়। বারানিকফের পিতা অ্যাকাডেমিশিয়ান বারানিকফ ছিলেন উক্রেইন-বাসী, অর্থাৎ দক্ষিণী লোক, কিন্তু তরুণ বারানিকফের স্ত্রী রুশীয়। শ্রীমতী বারানিকফ রুশীয় বলে বেশ তাঁর গর্ব। হেসে বললেন মেয়েদের কী খাটতে হয় দেখুন।

সকালে উনি তো বের হয়ে এসেছেন, তারপর আমাকে সংসার সামলিয়ে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, স্কুলের খাবার সঙ্গে দিয়ে, স্কুলে পাঠিয়ে তবে বের হতে হয়েছে। কথাটা খুবই সত্য, মেয়েদের ভীষণ খাটতে হয়। কারণ, বাজার করার কাজটাও গৃহিণীদেরই কর্তব্য ; কত ধানে কত চাল হয়— তার হিসাব মেয়েদেরই রাখতে হয়। রুশীয় মেয়েদের খাটুনির কথা শুনে দ্বিবেদীজীর মুখ খুললো ; তিনি আমাদের পরিবারের কথা পাড়লেন, অর্থাৎ আমার স্ত্রী হেড মিস্ট্রেসগিরি করে বিরাট স্কুল তৈরি করেছেন, ছেলেদের পড়িয়েছেন ইত্যাদি। আমি বললাম— ওসব কথা থাক। ওঁদের কথা শুনতে আমরা এসেছি।

আমরা যেখানে এলাম— সেদিককার রাস্তা-ঘাট এখনও ভাল হয় নি, ট্রামগাড়ি যাচ্ছে বটে মাঝখান দিয়ে কোন রকমে। স্কুল-বাড়ি বেশ বড়— পাশেই বোর্ডিং-হাউস। শুনলাম, ছেলেমেয়েরা সপ্তাহের ছয়টা দিন এখানে থাকে, ছুটির দিনে ও বড় ছুটিতে বাড়ি যায়। ছুটি পায় নভেম্বরে এক সপ্তাহ অর্থাৎ বিপ্লব দিনের স্মরণে উৎসবের সময়ে। জানুয়ারিতে এক সপ্তাহ ও গ্রীষ্মকালে এক মাস ছুটি। আমরা যখন স্কুলে ঢুকছি, তখন দেখি সিঁড়ি দিয়ে হুড়হুড়িয়ে ছেলেমেয়েরা নামছে কলকোলাহল করতে করতে ; আমাদের দেখে বলছে 'নমস্তে', 'নমস্তে'। এখানে হিন্দী পড়ান হয়— তাই এরা শিখেছে 'নমস্তে'। প্রধান শিক্ষিকার ঘরে গেলাম। সেখানে আরও কয়েকজন শিক্ষিকা উপস্থিত। শুনলাম এই বিদ্যালয় হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর। এখানে রুশ ভাষা ছাড়া হিন্দী ভাষা শেখান হয়— দ্বিতীয় মান থেকে দশম মান পর্যন্ত। হিন্দীতে কথা বলতে ও হিন্দী লিখতেও শেখান হয়। শিক্ষিকা বললেন— তাঁরা হিন্দী পুস্তক ভারত থেকে সহজে আনাতে পারেন না। বুঝলাম

না কেন— সবই তো সরকারী লেভেলে চলছে— তবে? যাই হোক— দ্বিবেদী বই পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আশা করি চণ্ডীগড়ে ফিরে গিয়ে এই শিক্ষার্থীদের কথা ভুলে যান নি। দ্বিতীয় ক্লাসের হিন্দী বই দেখলাম— হিন্দী-রুশ শব্দ রঙীন চিত্র দিয়ে সুন্দর করে ছাপা বাঁধাই। দেখলেই ছাত্রদের লোভ হয়। কিশলয়ের চেহারা মনে হল, আর মনে পড়ল— কিশলয় কেনবার সময় দোকানদারের অর্থপুস্তক গতাবার ফিকির।

এখানকার ছাত্রদের নানারকম বিজ্ঞান, হাতের কাজ শেখানো হয়। স্কুলের সঙ্গে একটা optical factory-র যোগ আছে— সেখানে একদল বড় ছেলে যায় কাজ শিখতে। চলতে চলতে দেখলাম একটা ঘরে physics পড়ান হচ্ছে। বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছে সব স্কুলেই। একটা ঘরে ছেলেদের হাতের কাজের নমুনাও দেখলাম।

ছোট ছেলেদের হিন্দী ক্লাসে গেলাম; ছাত্রছাত্রীরা উঠে নমস্কার করল ভারতীয় রীতিতে। এ ঘরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের ছবি দিয়ে একটা বোর্ড সাজিয়েছে— নিশ্চয়ই ভারতীয় অতিথিদের আগমনের জন্য এটা করা হয়েছে। একজন শিক্ষিকা তাদের হিন্দী পড়াচ্ছেন, প্রশ্ন হিন্দীতে, উত্তরও হিন্দীতে দিতে হয়। শিক্ষিকার হাতে সাইক্লোস্টাইল করা পাঠ। অর্থাৎ পাঠ তৈরি করে আসতে হয়েছে। বুঝলাম এদের পড়াতেও হয় আন্তরিকতার সঙ্গে, আর ছাত্রদের পড়তেও হয় মেহন্নত করে।

তারপর একটা ছাত্রসভা-ঘরে আমাদের স্বাগত করা হল। ছোট স্টেজ। বসবার চেয়ার সারি বাঁধা। সেই স্টেজে ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করল ও নানা রকমের গান গাইল। গান হিন্দী ফিল্মের 'মেরা জুতা হায় জাপানী', 'মসলা কিনো, মসলা

কিনো' জাতীয় গান ছাত্ররাও শিখছে। এই সব নিকৃষ্ট গান তারা শিখল কোথা থেকে? দ্বিবেদীকে বললাম, এই কি হিন্দী সাহিত্যের ও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নমুনা? বুঝলাম, যে সব রুশ যুবকরা ভারতে এসে এখানকার লোক-সংস্কৃতির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান, তাঁদের শিক্ষা বা রুচির পটভূমি খুব গভীর ও ব্যাপক নয়। বোম্বাই-দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সমাজতন্ত্রবাদের নামে আহূত সম্মেলনে যে-সব মজদুর শ্রমিক মিস্ত্রী ক্লাসকে জমায়েত হতে দেখেছি, রুশীয়রা তাদের সঙ্গে গলাগলি করে এই সব গান শিখে আসেন। ভারতীয়রা গদগদ হয়, সাহেবের কণ্ঠে তাদের ফিল্মের গান শুনে। আর যারা এইসব নিকৃষ্ট গান শেখে, তারা মনে করে এই তো লোক-সঙ্গীত! তারা মনে করে ভারতীয় 'জনতা'র সঙ্গে মিশে, গান শিখে ভাই-ব্রাদারীর বুনিয়াদ পত্তন করে এলাম। আসলে ভালো জিনিষ বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি—প্রচারকার্যে পরাভূত হয়েছি সর্বক্ষেত্রে।

সভাশেষে 'জনগণমন' গানটি গাইল; আমরা তিনজন দাঁড়ালাম।

এ সব হয়ে গেলে অন্যেরা চার তলায় গেলেন; আমি আর সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম না। ছেলেরা আমায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তির কাছে গেল এবং ফোটো ওঠাল। মোট কথা খুবই ভালো লাগল স্কুলটাকে দেখে। সোভিয়েত বুঝে নিয়েছে যে, ভারতে কাজ করতে হলে হিন্দী ও উর্দু ভালো করে রপ্ত করতে হবে এবং তা' তারা করছেন। ব্রিটিশ যুগে বিদেশী পাদ্রীরা ভারতীয় ভাষা শিখতেন খুব ভালো করেই। আমাদের বোলপুরে মেথডিস্ট মিশনের Meek সাহেব থাকতেন। তিনি আমেরিকান জার্মান। যেমন বিশাল দেহ তেমনি মোটা গলা, মাথায় মস্ত টুপি

পরে ঘুরতেন। Anna Tweed ছদ্মনামে তাঁর লেখা মুরগী পালন সম্বন্ধে বই থ্যাকার স্পিঙ্ক ছাপিয়েছিল। তিনি বাঙলা বলতেন একেবারে বীরভূমি উপভাষায়। পাশের ঘর থেকে কথা বললে কে বুঝবে যে গ্রাম্য চাষা কথা বলছে না। ডুমকায় থাকতেন বোডিং সাহেব-- নরওয়েজিয়ান। সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য আসেন। তাঁর মতন সাঁওতালী ভাষাবিদ্ এ পর্যন্ত হয় নি। খাসি ও নাগাদের নানা উপভাষা— সবই পাদ্রীরা আয়ত্ত করেছেন। আজ সোভিয়েত রুশরা শুধু যে ভারতের ভাষাগুলি শিখছেন তা নয় ; এশিয়া ও আফ্রিকার সকল ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই ভাবে স্বাভাবিক জয়যাত্রা সফল হবে। মানুষের মন হরণ করতে হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয়।

একখানা আমেরিকান পত্রিকায় (The New Leader) পড়েছিলাম— মস্কো প্রবাসী ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত দপ্তরের স্যার উপাধি ভূষিত জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি মস্কো বিমান বন্দরে সেদিন গেছেন। দেখেন, ঘানা থেকে আগত এক সাংস্কৃতিক মিশনকে সোভিয়েত সরকারপক্ষীয় লোক স্বাগত করতে এসেছেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে, ঘানার ভাষায় রুশরা অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লেখেন যে, ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদেশী ভাষাশিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম সোভিয়েতের তুলনায়। তিনি বলেন, এটা ভাববার কথা অ্যাংলো-আমেরিকানদের ভাবী নিরাপত্তার দিক থেকে।

বিদেশীর ভাষা জানা থাকলে কত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। চীন দেশে বক্সার

বিদ্রোহের পর্ব— সমস্ত য়ুরোপীয় দূতাবাস ধ্বংস হচ্ছে বিপ্লবীদের করস্পর্শে। পিকিঙের ফরাসী দূতাবাস আক্রান্ত। জনতা গেটের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য উন্মত্ত। এমন সময়ে একটি তরুণ ফরাসী ডাক্তার গেট খুলে বাইরে বের হয়ে চীনা জনতার সম্মুখে চীনা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। বিদেশীর মুখে চীনা ভাষায় তাদের ডেকে কথা বলতে শুনে তারা থমকে দাঁড়াল; দূতাবাস রক্ষা পেল জনতার উন্মত্ত ক্রোধ থেকে। এই যুবকের নাম ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত, ইনি পল পেলিও।

মনের মধ্যে অনেক কথা জমে উঠছে এই ভাষা নিয়ে। রুশ ভাষা আজ বাল্টিক সাগরতীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরতীর পর্যন্ত, আর উত্তর মেরু থেকে কারাকোরাম পর্যন্ত ভূভাগে বিচিত্র জাতি-উপজাতির লোকে মেনে নিয়েছে রাষ্ট্রভারা বলে। রুশীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য তাদের আকর্ষণ করছে— বুঝছে এই ভাষার জানলা দিয়ে জ্ঞানের আলো তারা পাবে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য যদি এটি করা হত তবে ফল উল্টোই হত। পোলদের তো রুশী করবার প্রচণ্ড চেষ্টা হয়েছিল; আইরিশদের ইংরেজি ভাষা গেলাবার জন্য কি নিষ্ঠুরতাই ইংরেজ করেছিল। কোরিয়াকে জাপানী-ভাষী করবার জন্য কি তাণ্ডবই রণকামী জাপানীরা করেছিল! ব্রিটিশ যুগের শেষপাদে ভারতের কয়েকটা প্রদেশে যখন কংগ্রেস সরকার শাসন ভার পান, তখন হিন্দীকে চালু করা নিয়ে কী হয়েছিল সেটা ভুলে গেছি আজ। রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে হিন্দী ভাষা চালু করার জন্য কম উপদ্রব করেছিলেন? সে কথা ভুললে চলবে কেন? আজ তারই ফলে সেখানে হিন্দী ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, এমন কি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঘরের কাছে

বিহারে বাঙালীদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে বাস করবার ব্যবস্থা হয় এই সময়েই। আসামের 'বঙাল খেদা' আন্দোলন স্বাধীন ভারতেই তো হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরোধ ভাষা নিয়ে! মোট কথা, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের আইডিয়া গ্রহণের ফলে ভারতময় ভাষা নিয়ে মাথা ভাঙাভাঙি শুরু হয়ে গেছে। ভাষা সমস্যার সমাধান রুশ করেছে। তার মূলে আছে রুশ সাহিত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ— ভারতের কোন ভাষা সে দাবী করতে পারে?

হিন্দীভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে, লোকে আপনিই সে ভাষা শিখত নিজের গরজে। গৌরীশঙ্কর ওঝা ভারতীয় লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন; যে কেউ এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাঁকে হিন্দীতে ঐ বই পড়তেই হয়। তা নিয়ে আইন করতে হয় নি! সাহিত্যের ঐশ্বর্য জানবার জন্য কাউকে বাধ্য করতে না পেরে আইনের সাহায্য নিয়ে ভাষা চালু কি সম্ভব?

হিন্দী স্কুল দেখে নেমে এলাম; অ্যাকাডেমির মোটর এল ঠিক ছুটোর সময়— যে সময়ে আসবার কথা ছিল। হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হলাম লেনিনগ্রাদ য়ুনিভার্সিটি দেখবার জন্য। সেই নেভা নদী কতবার পারাপার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছলাম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এর সাজসজ্জা সেকেলে। প্রথমেই তো দেখি লিফট নেই। পুরানো বাড়ি শ-দুই বছরের হবে, জীর্ণতার লক্ষণ সর্বত্র। এখানেও মস্কোর ন্যায়ই প্রাচ্য বিভাগ ছাড়া চৌদ্দটি বিভাগ আছে; এটা হচ্ছে সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ প্যাটার্ন। একটা ঘরে আমরা বসলাম— অধ্যক্ষ ও প্রাচ্যবিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এলেন; এঁদের মধ্যে ছিলেন নোবিকোভা ও অরুণা হালদার। অরুণা দেবী শ্রীগোপাল হালদারের স্ত্রী;

গোপালও এখানে আছেন আজকাল। অরুণা পাটনায় অধ্যাপিকা ছিলেন; সোভিয়েত থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন— বাংলা ও দর্শনশাস্ত্র পড়ান। অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই প্রাচ্যবিভাগ ও অ্যাকাডেমির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অধ্যক্ষ বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অ্যাকাডেমিতে গবেষণার কাজ হয়। এখানকার অধ্যাপকরা ওখানকার গবেষক। নোবিকোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং অ্যাকাডেমির কর্মী। কিন্তু বারানিকফের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ নেই, তিনি অ্যাকাডেমির লোক; অবশ্য পড়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী বিভাগে।

প্রাচ্য বিভাগের লাইব্রেরী দেখলাম— অত্যন্ত স্থানাভাব। বইপত্র স্তূপীকৃত, শেল্‌ফে বই সুসজ্জিত নয়; ছিন্ন বই অনেক মনে হল, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় সোভিয়েতের দুয়োরাণী; এককালে সে সোহাগে ছিল বলেই বোধ হয় মস্কো সুয়োরাণী হয়ে সমস্ত আদর ও মনোযোগ টেনে নিয়েছে। তবে দুয়োরাণী হলেও সে তার আভিজাত্য বজায় রেখেছে। লেলিনগ্রাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সৌধ ও হর্ম্যের মধ্যে আভিজাত্যের স্পর্শ এখনো লোপ পায় নি।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, সেখানে প্রাচ্যবিভাগের কর্মীরা জমায়েত হয়েছেন। বাংলা, হিন্দী, তামিল, উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা যাঁরা শিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। একজনের নাম শুনলাম, বগদানোভ; নামটা শুনেই শান্তিনিকেতনের বহুকালের পুরানো কথা মনে পড়ল। যুবকটিকে বললাম, বিশ্ব-ভারতীতে বগদানোভ নামে একজন রুশ অধ্যাপক ছিলেন ফরাসী ভাষায় মহাপণ্ডিত।

লেনা নামে একটি মেয়ে দেখা করল। বেশ বাঙলা বলে। সে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, শারদোৎসব, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী নিয়ে নাটকের এক তত্ত্ব-কথা লিখছে। কবির প্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কথা বললাম, সেই নাটকে কবি একটা বড় সমস্যার কথা তুলেছিলেন— সেটা হচ্ছে অচ্ছুৎ সমস্যা। আমি বললাম, কবি এই নাটকের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু অচ্ছুৎ সমস্যাটা যে ছিল, সে কথাটা চাপা পড়েছে। বিসর্জন সম্বন্ধে বললাম— এটা হচ্ছে হত্যার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবির জেহাদ। এই ধরনের আলোচনা হল মেয়েটির সঙ্গে। আর একটি মেয়ে 'বাঁশরী' নিয়ে কাজ করছে। এ দুজনের সঙ্গে পরে দেখা হয় নোবিকোভার বাসায়। এদিন আমরা নোবিকোভাকে কিছু উপহার দিলাম। ভারত সরকার আমাদের আসবার সময়ে কৃপালানী মারফত কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য সবই কৃপালানীকে করতে হয়েছিল— কেনাকাটা, প্যাকেট বাঁধা সবই। আমরা সোভিয়েত সরকারের অতিথি— সৌজন্যের জন্য এসব দেওয়া-থোওয়া। আমি এনেছিলাম বটপাতার উপর কবির মূর্তি ; এটি করে দিয়েছিলেন আমার ছোট বৌমা ; তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ছাত্রী— অল্পকাল পূর্বে 'বটানী'তে এম. এ. পাশ করেছেন, পাতা ফুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির সখ এখনও আছে।— বটপাতার উপর কবির মূর্তি ছাড়া, আমি দিলাম রবীন্দ্র ক্রনিকল্ (যা সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত শতবর্ষ-পূর্তি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল— আমার ও শ্রীক্ষিতীশ রায়ের যৌথ নামে)। আমার নব-প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' একখণ্ড দিলাম। নোবিকোভা তাঁর ফ্ল্যাটে একদিন যাবার জন্য আবার অনুরোধ জানালেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে মার্কেটে চললাম। মস্কো থেকেও

কিছু কিনেছিলাম ; লেনিনগ্রাদ থেকে কিছু কিনব বলেই সেখানে যাওয়া। যেখানে যাই স্থানীয় কোন নিদর্শন সংগ্রহ করি— সে জিনিসের কোন ব্যবহারিক দিক আমার কাছে না থাকলেও। লেনিনগ্রাদের বিরাট মার্কেট— নানা রকমের সৌখিন জিনিসে দোকান বোঝাই— কি নেই ? ছুঁচ থেকে মোটর গাড়ি সবই। কিছু খেলনা কেনা গেল— কৃপালানীরা ক্যামেরা কিনলেন। আমি কিনি পরে মস্কো গিয়ে। রুশের কাঠের খেলনা বিখ্যাত, বিশেষতঃ একটা পুতুলের মধ্যে পাঁচটা পুতুল— একটা খুলছে আর একটা বের হচ্ছে। এরকমের কৌটো দেখেছিলাম··· কাশীর তৈরি— বোধ হয় পঞ্চাশটা ছিল একটার মধ্যে একটা, শেষটা সরষের মত ক্ষুদে। এ ছাড়া মোমের তৈরি পুতুল বিখ্যাত।

ঘুরতে ঘুরতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেতে হবে বারানিকফের বাসায়। সেখানে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য একটা অন্ধকার গলি ধরে, একটা বিরাট বাড়ির কানাচ দিয়ে জলকাদা বাঁচিয়ে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। শুনলাম চারতলায় এঁদের ঘর। লিফট নেই। ধীরে ধীরে উঠলাম। সিঁড়ি ও ল্যাণ্ডিং মাঝে মাঝে— খুব পরিচ্ছন্ন লাগল না। উপরে উঠে দেখি, মাদাম বারানিকফ, তাঁর মেয়ে ও ছেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়িতে একটি maid বা ঝি পেয়েছেন। এটা পাওয়া খুব দুষ্কর ; বাড়িতে ঝি-গিরি করতে চায় না বড় কেউ। খান-চার ঘর, দেয়ালে র‍্যাক— বই-এ বোঝাই। বারানিকফের পিতার আমল থেকে বই জমছে। হিন্দী বহু বই, হিন্দী কোষগ্রন্থ কত রকমের ; ভারতীয় সংস্কৃতির বহু বইও কম নয়। একজন সুধী ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করেছি বোঝা যায়। সুনীতি চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকলে ঠিক এই ভাবটা মনে হয়। তবে এদের ঘরবাড়ি

সঙ্কুচিত। তাই বসবার ঘরকে খাওয়ার ঘরে পরিণত করতে হয়— বৈঠকখানা ঘর এদের নেই। খাওয়ার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী দিচ্ছে-থুচ্ছে; কাঁটা চামচে দিয়ে খাওয়া বলে দিতে অসুবিধা হয় না। রুশী খানা ছাড়াও বড়ি, মটরশুঁটি, কপি দিয়েও তরকারি রেঁধেছে। বড়ি, পাঁপর, আচার সব আনিয়েছে দিল্লী থেকে বন্ধুদের মারফত— হামেশাই তো যাওয়া-আসা চলছে। তাই খানাটা হল ইণ্ডো-সোভিয়েত খানা— রুটি, চীজ, শিককাবাব, মাছ, সসেজ প্রভৃতি। মদ আজারবৈজানের বিশেষ ব্র্যাণ্ড। আমি ও দ্বিবেদী সামান্য খেলাম— স্পর্শমাত্র; ভদ্রতার জন্য খেতেই হয়। দিল্লীতে ভদ্র সমাজে অর্থাৎ উচ্চ অফিসী ও কারবারী মহলের সাহেব ও তাঁদের মেম অর্থাৎ ভারতীয় গিন্নীদের মহলে এটার চল হয়েছে। ইংরেজ গিয়েছে— তাই ইংরেজিয়ানাটা আঁকড়ে ধরেছি। ইংরেজের সময়ে যে সব ক্লাবে ঢুকতে পেতাম না, সেখানে তো এখন রাম রাজত্ব হয়েছে। 'ভ্রাই' বোম্বাইয়ের চেহারা দেখে এসেছি!

খাওয়ার পর বারানিকফ তাঁর টেপ রেকড বের করে হিন্দী গান শোনালেন। দিনকর যোশী এসেছিলেন, তাঁর কবিতা আবৃত্তি ধরে রেখেছেন এই যন্ত্রে। সেটা শোনালেন। গত বৎসর সাহিত্য আকাদেমি-আহূত রবীন্দ্র উৎসবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা বহন করে যে ভাষণটি দেন, সেটি সকলের ভালই লেগেছিল। বারানিকফ এবার দ্বিবেদীর কণ্ঠ টেপ রেকর্ডে উঠিয়ে নিলেন। সেটা আবার শুনলাম তখনই। কি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

নেমে দেখি বৃষ্টি পড়ছে, হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রলিবাস পেলাম। দশটা বেজে গেছে— ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। বাসও হোটেলের রাস্তা পর্যন্ত গেল না। অবশিষ্ট পথটা হেঁটেই এলাম। রাত

দশটার পর বৃষ্টি টিপটিপ পড়ছে, তার মধ্যে চলার অভিজ্ঞতা হল।

বারানিকফের ঘরে বসে থাকতে থাকতে কামানের আওয়াজ শুনলাম, জানলা দিয়ে দূরে হাউই-এর ঝলকানি দেখা গেল। নেভার ওপারে দুর্গ আছে— সেখান থেকে এসব হচ্ছে। টেলিভিশনে ক্রুশ্চেভকে দেখলাম; তিনি মস্কোতে ফিরেছেন— ক্রেমলীন থিয়েটারে ভাষণ দিচ্ছেন। কয়দিন আগে মধ্য এশিয়ায় ছিলেন। আমরা যখন তাসকন্দে, তখন তিনি ঐ অঞ্চলে সফর করছিলেন। শুনলাম, আজ মস্কোতে বিরাট উৎসব হচ্ছে। দেড়শ' বৎসর পূর্বে ১৮১২ সালে এই সময়ে নেপোলিয়ন মস্কো আক্রমণ করেছিলেন; পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলেন— ভেবেছিলেন, রুশ সম্রাট কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবেন। অপেক্ষা করে করে শেষকালে উনিশে অক্টোবর ফিরতে শুরু করে। এই দিনে মস্কো পুড়ছে নিজেদের হাতের আগুনে শত্রুকে জব্দ করার জন্য। সেইজন্য উৎসব। মস্কোতে ফিরে গিয়ে যে 'প্যানোরোমা' দেখতে যাই তা এই ব্যাপার। সে কথা যথাস্থানে বলব।

১৬

লেনিনগ্রাদ

১৯ অক্টোবর ১৯৬২

আজ সকালে চললাম স্মোলনীতে। সেখানে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯১৮ মার্চ পর্যন্ত লেনিন প্রতিষ্ঠিত নয়া সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের কেন্দ্র ছিল। তারপর মস্কো হয় রাজধানী।

আমরা যে অট্টালিকার সম্মুখীন হলাম, এখন সেটা লেনিনগ্রাদ কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তর। বারানিকফ পার্টির সদস্য; তাই দেখলাম, সেখানে তাঁকে অনেকেই চেনে। এই বাড়িটা ছিল সম্রাটদের সময়ে রাজকুমারীদের বোর্ডিং হাউস ও বিদ্যালয়। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এ বাড়ি নির্মাণ করান। পীটারের পর ইনিই রুশীয়দের মধ্যে পশ্চিম য়ুরোপের শিক্ষা সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজন করেন। সে সময়ে ফরাসী ভাষা শেখা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। এই বিরাট বাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়, জার শাসনের অবসানে; অবশ্য তখনো নিকোলাস সপরিবারে জীবিত; কিন্তু পলাতক হয়ে বন্দী অবস্থায় আছেন। বিপ্লব শুরু হলে সপরিবারে নিকোলাসকে নজরবন্দী করে রাখা হয় Tsarskoe-Selo-র প্রাসাদে, পেত্রোগ্রাদ থেকে মাইল পনেরো দক্ষিণে অবস্থিত (বর্তমান পুশকিন)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই প্রাসাদে ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম বিজলি বাতি হয়— তখন য়ুরোপে কোন রাজবাড়িতে বিজলি বাতি জ্বলে নি— গ্যাস জ্বলত এই প্রাসাদ থেকে জারকে সপরিবারে নিয়ে যাওয়া হয় সাইবেরিয়ার তোবলস্কে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে। সোভিয়েত সরকার নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলে বন্দী রাজপরিবারকে নিয়ে যায় Ekatering-burg শহরে, যার বর্তমান নাম Sverdlovsk, একেবারে উরাল

পাহাড়ের পূর্বদিকে। মস্কোতে লেনিন অধিষ্ঠিত হবার মাস তিন পরে ঐ সুদূর মফস্বল শহরে নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এ সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লেনিনের যোগ ছিল না, তখন বহুরাজকতা বা অরাজকতার পর্ব। স্থানীয় সোভিয়েত সর্দারের হুকুমে এঁদের মারা হয়।

য়ুরোপে ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে চার্লসের এবং ফ্রান্সে লুই-এর মুণ্ডপাত হয়েছিল; কিন্তু শিরশ্ছেদের আগে বিচারের অভিনয়ও হয়েছিল। নিকোলাসের বেলায় সেটাও দেখা যায় নি। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, স্তালিন-এর আমলে অবাঞ্ছিতরা অদৃশ্য হয়ে যেত।

স্মোলনীর বিরাট অট্টালিকার দোতলার এক প্রান্তের ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেটা ছিল লেনিনের অফিস, তাঁর ঘরবাড়ি— ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত এই চার মাস। সামনের ঘরে দুখানি চেয়ার, একটা টেবিল। এই ঘরে দেখা করতে আসত পার্টির লোক থেকে দীনতম সর্বহারা রুশ চাষী মজুরের প্রতিনিধিরা। পাশের ছোট্ট ঘরে দুখানা বিছানা, অত্যন্ত সাধারণ তৈজসপত্র। সেটাতে লেনিন ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। লেনিন তাঁর স্ত্রীকে পান— যখন তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকতেন।

এই ঘরে যখন আছি, তখন দেখি একটি লোক কি সব যন্ত্রপাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হল একটু পরেই; দুইজন রুশ ভদ্রলোক এসে বললেন, তাঁরা মস্কো রেডিওর প্রতিনিধি— আমাদের কথা কিছু তাঁরা শুনতে চান লেনিন সম্বন্ধে; বারানিকফ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। আমি বাঙলায়, দ্বিবেদী হিন্দীতে বললেন কিছু, টেপরেকর্ডে উঠিয়ে নিল তারা। বললাম, লেনিনের ঘরে আসাটা প্রায় তীর্থ-দর্শনের মতো। লেনিন বিশ্বশান্তি চেয়েছিলেন

— আর চেয়েছিলেন সর্বহারাদের সম্মান দিতে। আজ তাঁর সেই ঘরে বসে তাঁর কথা বলতে পেয়ে আমরা কৃতার্থ হলাম।

এই বাড়ির একটা বড় হলে গেলাম, দরবার ঘরের মতো ; সে যুগে সমাবর্তন প্রভৃতি হত, মেয়েদের সভাগৃহও বোধহয়। সেই ঘরে প্রথম সোভিয়েত সভা বসে। প্রাচীরগাত্রে সোভিয়েত প্রথম কনস্টিটিউশন বা সংবিধান সোনার অক্ষরে খোদাই করে লেখা। অবশ্য এটা রুশীয় সোভিয়েতের সংবিধান, পরে নিখিল সোভিয়েতের জন্য কনস্টিটিউশন গড়া হয়।

স্মোলনীতে এক সময় নৌকা গড়া হত। স্মোলনী নামে একরকম গাছের রস কাঠের নৌকার উপর লাগানো হত, সেই জন্য এদিকটার নাম স্মোলনস্কি। মনে পড়ল আমাদের দেশে গাব গাছের কথা— যার রস নৌকায় ব্যবহৃত হত, জলসহা করবার জন্য। ক্যাথারিন এখানে এই সৌধ নির্মাণ করান, আর নিকটে একটা বড় ক্যাথিড্রালও বানান। সেটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ; শুনেছি দেখবার মতো, কিন্তু সময় নেই, মাত্র চার দিনের মেয়াদ এই মহানগরীতে।

এবার চলেছি Razliv-এ ; এখানকার বার্চবনে লেনিনকে আশ্রয় নিতে হয়, দেশ থেকে পালাবার পূর্বে। লেনিনের জীবনীর সঙ্গে এ স্থানটি জড়িত বলে, তা' আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। লেনিনের জীবনী আলোচনার ক্ষেত্র এ প্রবন্ধ নয়, তবে দুই-একটা কথা না বললেও তাঁর Razliv-এ বসবাসের কারণটা জানা যাবে না। রুশিয়ার বিপ্লব একদিনে হয় নি এবং একটা লোকের দ্বারাও সংঘটিত হয় নি। বহু বৎসর ধরে বহু নরবলির পর মুক্তি এসেছে। লেনিনের বড়দাদা জার শাসন ধ্বংস করতে গিয়ে অত্যাচারী শাসকের রজ্জুতে প্রাণ দেন। এরকম অগণিত নরনারীর প্রাণ যায়।

বহু সহস্রের জীবন কাটে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিনকেও সে জীবনের স্বাদ পেতে হয়। সে ইতিহাস এখন থাক। লেনিন বহুকাল থাকেন রাশিয়ার বাইরে। জেনেভা ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্র। সেখান থেকে পত্রিকায় লিখে পাঠান প্রবন্ধ, পত্র লেখেন দলের সাকরেদদের। তারপর একদিন মতভেদ হল প্লেকনভ ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে; তাঁরা ধীর পদক্ষেপে ডাইনে-বামে চোখ রেখে চলতে চান। সেই মডারেট বা স্থিরবুদ্ধি মেনসেভিকদের ত্যাগ করে জনতা বা বলশেভিক দল গড়লেন। ইতিমধ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গে ১৯০৫ সালের শেষদিকে বিপ্লবের উৎসব শুরু হয়ে গেছে; চারদিকে হরতাল বিক্ষোভ। লেনিন জেনেভা ছেড়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে এলেন। কিন্তু আত্মগোপন করে থাকতে হয় পুলিশের ভয়ে। সেণ্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিক হরতাল ও বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দলন করল জারের জল্লাদরা। লেনিন দেখলেন, নগরে থাকা নিরাপদ নয়। তাই তাঁকে নাম পাল্টে চেহারা বদলে ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়।

ঘণ্টাখানেক মোটরে চলেছি— গ্রাম, ছোট শহর পেরিয়ে। কত রকমের ঘর-বাড়ি, কত বিচিত্র মানুষ। ফিনল্যাণ্ড যাওয়ার রেলপথ পাশে পাশে আছে। এক জায়গায় লেভেলক্রসিং-এর কাছে এসে দেখি ট্রেন আসবে বলে গেট বন্ধ। মোটর থেকে নেমে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম ফিনল্যাণ্ড উপসাগর তীরে। সমুদ্রের অংশ— ঢেউ আছে, তবে উত্তাল নয়। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, ভিজে বালিতে জুতা বসে যাচ্ছে। সাগরতীরে একটা বাড়ি — চাষীর বলেই মনে হল। ছোট ক্ষেত আছে; হাঁস, শূয়োর পোষে। বারানিকফ দেখালেন দূরের দ্বীপ, একটা দুর্গ— এখানে

জার্মানরা এসেছিল। ঘাটের কাছে ভাঙা লোহার কি সব জলের মধ্যে রয়েছে, সেগুলো জার্মানদের নৌকা করে ডাঙায় নামতে বাধা দেবার জন্য রাখা হয়েছিল, সরানো হয় নি— স্মৃতিচিহ্নরূপে রাখা আছে।

আমরা এলাম রাজলিভ-এ, যেখানে লেনিন পেত্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাম বদলে, তাতারদের টুপি পরে গোঁফদাড়ি কামিয়ে কাঠুরিয়া সেজে তিনি এই বনে বাস করেছিলেন কুঁড়েঘর বানিয়ে। ঘাসের তৈরি ঝুপড়ি যেমন আমাদের দেশে মাঠে দেখা যায়, ক্ষেত পাহারার জন্য চাষীরা বানায়। ঘরের মডেল করা আছে সেই ভাবেই, বছর দুই অন্তর নূতন ঘাস দিয়ে ছাওয়া হয়। যেখানে ঝুপড়িটা আসলে ছিল, সেখানে পাথর দিয়ে একটা অবিকল প্রতীক নির্মাণ করা হয়েছে। এ যেন শিবঠাকুরের খড়ের ঘরটাকে পয়সা হলে ইট পাথরে তৈরি শিবমন্দির বানানোর মতো। ছেঁড়া-কাপড় ভিক্ষা করে চীবর তৈরি করে দিতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা; এখন আস্ত রঙিন দামী কাপড় কিনে চিরে চিরে টুকরো করে জোড়া দিয়ে বৈরাগ্যের প্রতীক চিহ্ন চীবর তৈরি করা হয়। নিকটে একটা কাঠের ঘর— ম্যুজিয়ম। সেখানে যে লোকটি ছিলেন, তিনি সব ইতিহাস শোনালেন। ছবি যা দেওয়ালে টাঙানো আছে, বুঝিয়ে দিলেন। লেনিন পালাচ্ছেন— পুলিশ খবর পেয়েছে। ফিনল্যাণ্ডে যাবার রেলগাড়ির প্রত্যেকটি কামরা পুলিশে ও সৈন্যে খানাতল্লাসী করছে। লেনিনকে পাওয়া গেল না। ট্রেনের ইঞ্জিনের কুলি হয়ে লেনিন তখন আছেন ঐ গাড়ির ইঞ্জিনে। ড্রাইভার সবই জানে, তাই সে ইঞ্জিনটাকে কেটে আগিয়ে নিয়ে গিয়েছে— জল খাওয়াবার জন্য। সেখান পর্যন্ত পুলিশের সন্দেহ পৌঁছায় নি— তাই ধরা পড়লেন না, পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন।

ম্যুজিয়ামের পরিদর্শককে বললাম – এখান থেকে কিছু স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাব— মার্গেরিটার তুটো ফুল চাইলাম। তিনি তাঁর বাড়ি থেকে কয়েকখানা ছবি ও বাগান থেকে ফুল তুলে একটা বোকে (boquet) করে দিলেন। ইনি এই অরণ্যের মাঝে বাস করেন। বড় একটা ম্যুজিয়ম তৈরি হবে শুনলাম ; অনেক কুলি কাজ করছে। তবে কুলি বললেই আমাদের দেশে যে চেহারা ফুটে ওঠে, সেটা অবশ্য সেদেশে দেখা যায় না, শীতের জন্য তাদের পায়ে রবারের হাঁটু পর্যন্ত বড় বুট জুতো, গায়ে ওভার-অল কোট। কাজের শেষে এসব ঝেড়ে ফেললেই আসল মানুষটির চেহারা বের হয়ে আসবে। তখন তাকে আর মাটিকাটা কুলি বলে চেনা যাবে না। আর আমাদের দেশে— তাদের ধুলোমাটি স্নান করলে যায়— কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দৈন্য ঘোচে না।

ফেরবার সময় হল। দেখি আরও গাড়ি— একটা বাসও এসেছে। বাসটাকে আমাদের হোটেলে দেখেছিলাম, মনে হল এরাও টুরিস্ট।

শহরে ফিরলাম— বেলা আড়াইটে হয়ে গেছে। অরুণা হালদার আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। গোপাল হালদার এসেছেন, তা তো আগেই বলেছি। বেশ ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছেন— পাঁচখানা ঘর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বললেন। আরও মুশকিল এই— বাড়ি সাফ রাখার সমস্যা। ঝি পাওয়া যায় না। একজন সপ্তাহে আসে, মেঝে দরজা-জানলা সাফ করে, সপ্তাহে তিন রুবল নেয় এই কাজের জন্য অর্থাৎ আমাদের টাকার ষোল টাকা। বাজার হাট নিজেকেই করতে হয়। অরুণা দেবী নিরামিষাশী। আমাদের মধ্যে দ্বিবেদী শাকান্নভোজী। আমরা সর্বগ্রাসী। তাই অরুণা দেবীকে তুই প্রস্থ রান্না করতে হয়েছে।

মাছের বড়া, বিশেষ পক্ষীমাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচারই ছিল। খাওয়া আর গল্প চলছে বাঙলা, হিন্দী, ইংরেজি ভাষায়। মনে পড়ল নোবিকোভা য়ুনিভার্সিটিতে বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে এক সন্ধ্যায় খাবার জন্য। তাই অরুণা দেবীর বাড়ি থেকে ফোনে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বললাম— আগামী কাল সন্ধ্যায় যাব, কিন্তু চা ছাড়া যেন বেশি কিছু না করেন। বারানিকফের খুব ইচ্ছা নেই নোবিকোভার বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি ; তাঁর মনোভাব প্রসন্ন নয় ; কেন বুঝলাম না। বরাবরই দেখছি একটু ঠেশ আছে। ভারত থেকে যাঁরা আসেন, নোবিকোভাকে সকলেই জানে, নোবিকোভাও বাঙালী লেখকদের অনেককেই চেনেন— সেইজন্য কি ? বলতে পারি নে।

অরুণা দেবীর বাসা থেকে নামলাম ; ফ্ল্যাটটা চার তলায়। নেমে একটা চত্বর পেলাম, সেই চত্বরের চারিদিকে বাড়ি এবং সবগুলিতে ফ্ল্যাট প্রথা।

এখান থেকে চললাম লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত প্রাসাদ Hermitage ও Winter Palace দেখতে। বারানিকফের কাজ ছিল বলে তিনি পৌঁছিয়ে চলে গেলেন। একজন মহিলা আমাদের দেখানোর ভার নিলেন, তিনি ইংরেজি জানেন। পরে শুনলাম— বিদুষী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী।

রুশ সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের বহুকালের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানকার আসবাবপত্র, ছবি, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ট্যাপেস্ট্রি প্রভৃতির সঙ্গে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করান ক্যাথারিন। প্রাসাদের নাম Winter Palace, একটা অংশ Hermitage, দুটো অংশের মধ্যে সেতু আছে ঘরের মতোই। আমরা ঘণ্টা দুই তিন ঘুরলাম। সমস্ত যদি হাঁটতাম, তবে পনের মাইল পথ চলতে হত। কত দেখব ?

করিডর, সিঁড়ি প্রভৃতি বাদ দিলেও ঘরের সংখ্যা হাজার দেড় হবে। তার মধ্যে চার শ' কামরায় প্রদর্শনী। বৎসর খানিক থাকতে পারলে কিছুটা দেখা হত। রেমব্রাণ্টের, রুবেন্সের কত ছবি। নানা যুগের ট্যাপেস্ট্রি— ছবির মতো করে বোনা; আর কি বিরাট! সমস্ত প্রাচীর জুড়ে আছে। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জোরালো। একটা বিশাল ঘরের মেঝে রঙিন কাঠের তৈরি, ঠিক যেন শতরঞ্চ। এত মসৃণ— ভয় হয়, পা পিছলে যাবে। রত্নগৃহ দেখবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তবু বিদেশী অতিথি বলে দেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রাসাদের একটা ছোট ঘর দেখানো হল— সেখানে সোভিয়েত-পূর্বের শেষ শাসকরা ধরা পড়েন বিপ্লবীদের হাতে।

সাড়ে পাঁচটার সময় বারানিকফ এলেন। হোটেলে ফিরলাম ছয়টা নাগাদ। বিশ্রামের সময় নেই, থিয়েটার দেখতে যেতে হবে— ডস্টয়েভস্কির ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট অভিনয় হবে। পূর্বেই টিকিট কিনে রাখতে হয়— স্থান পাওয়া খুব মুশকিল। সোভিয়েতের সিনেমা, থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেলে কেউ ঢুকতে পায় না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চললাম। এই প্রেক্ষাগৃহ খুব বড় নয়; আর চেয়ারগুলো খুব আরামের নয়। মনে হচ্ছিল যেন ঘোড়ার পিঠের উল্টো জিন-এর উপর বসেছি। স্টেজটি বেশ বড় এবং ঘুর্ণায়মান; দৃশ্যপট সুন্দর অর্থাৎ স্বাভাবিক। এর তুলনায় আমাদের নামকরা অভিনয়-মঞ্চগুলি অত্যন্ত সেকেলে মনে হয়। আমার তো 'সেতু'র রেলইঞ্জিন দেখে হাসি পেল; আমাদের দেশের দর্শকদের শিশুমনের উপযোগী। ইন্টারভ্যালে দেখা করতে এলেন শোভা সেন ও উৎপল দত্ত। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় বোলপুরে; লিটল থিয়েটারের দল 'নীচের মহল' ও 'ম্যাকবেথ' নাটক অভিনয়

করতে এসেছিলেন। 'নীচের মহলে' গর্কির 'লোয়ার ডেপথস' নাটকের বাঙালী পরিবেশে বাঙলায় রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। আমাকেই সেদিনকার অভিনয় উদ্বোধন করে গর্কি সম্বন্ধে এবং তাঁর নাটক সম্বন্ধে বলতে হয়। সে সময় উৎপলদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাই সোভিয়েত দেশে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁরা খুশী হন। উৎপল বললেন, তাঁরা এসেছেন সোভিয়েতের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় দেখবার জন্য।

আমরা প্রথম দৃশ্য দেখার পর চলে এলাম। তিনটা দৃশ্য আছে ; শুনলাম ঘণ্টা চার লাগবে। দুবার ইন্টারভ্যালে আধঘণ্টা গেলেও সাড়ে তিনঘণ্টা পুরো অভিনয়। উপন্যাসকে নাটক করলে যে দোষ, তা মনে হলো এই অভিনয়ে আছে— বক্তৃতাগুলো অতি দীর্ঘ। হতে পারে ভাষা বুঝছিলাম না বলে অসোয়াস্তি লাগছিল। গোরা উপন্যাসের লম্বা বক্তৃতাগুলি পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু অভিনয়মঞ্চে সেটা মানায় না। ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টেও আমার সেইটা মনে হচ্ছিল— বইটা যখন পড়েছিলাম, তখন তার যে রস পেয়েছিলাম, এখানে তার যেন অভাব লাগলো।

১৭

লেনিনগ্রাদ

২০ অক্টোবর ১৯৬২

আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। আসতোরিয়া হোটেলের কেন্দ্রীয়-তাপ দেওয়া ঘরে আরামে থাকার ফল। নীচে নামলাম ; লিফটে সেই বুড়ী, যাকে প্রায়ই দেখি। ঠাকুরমার ঝুলির বুড়ীর মত চেহারা— অজানা ভাষায় তার আনন্দ প্রকাশ। নীচে এসে দেখি বারানিকফ এসেছেন। ব্রেকফাস্ট খেলাম পেট ঠেসে। তারপর এবার চলেছি পুশকিনের বাড়ি দেখতে।

আজ শনিবার ; বাড়িতে গিয়ে দেখলাম— লেখা আছে— শনিবারে বেলা একটার পর খুলবে ; এখন বেলা এগারোটা মাত্র। বারানিকফ কাকে কি বললেন, গাইড মহিলা এসে গেলেন একটু পরেই। ছোটখাটো বাড়িতে অনেকগুলি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ঘরের দেওয়ালে পুশকিনের নানা বয়সের ছবি, সমকালীন সেন্ট পিটার্সবার্গের ছবি— তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি ; যে আততায়ী বন্ধুর গুলীতে তিনি মারা পড়েন তারও ছবি ; ডুয়েলে আহত হয়ে বাড়ি আসার ছবি। ব্যাপারটা ঘটেছিল, তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর নামে কুৎসা রটনা নিয়ে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ বৎসরে পুশকিনের জন্ম (১৭৯৯)। মায়ের দিকে তাঁরা ছিলেন আফ্রিকার লোক ; তাই পুশকিনের টেবিলের উপর দেখলাম নিগ্রোর মূর্তি। রুশীয় নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা পুশকিন। ফরাসী সাহিত্যের সেরা বই সবই দেখলাম তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে। সেক্সপীয়র পড়েছিলেন ফরাসী তর্জমায়। Racine-এর পেলব, দরবারী নাটক থেকে সেক্সপীয়রের স্বাভাবিক

সেই বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটা ঘরে ছোটোখাটো স্টেজ আছে। শুনলাম আমাদের জন্যই বিশেষ একটা সিনেমা দেখানো হবে— Defence of Leningrad। দর্শক আমরা তিনজন ও বারানিকফ— ছবির গল্পাংশ ইংরাজিতে বলা হচ্ছিল।

হিটলারের নাৎসীবাহিনী লেনিনগ্রাদ চারদিক থেকে ঘিরেছে— বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেশ থেকে। নাৎসী দুশমনরা পুরাতন রাজধানী পেত্রোহফ বা পেত্রোডোতেস দখল করেছে— তৈজসপত্র, ছবি, ভাস্কর্য রুশ সরকার পূর্বাহ্নে সরিয়ে ফেলেছিল; কিছুটা পুঁতে রেখেছিল। তবুও দুর্বৃত্তদের হাতের ছোঁয়া যেখানে লেগেছে সেখানে তার দাগ রেখে গেছে। পুরাতন রাজধানী দখল করে, লেনিনগ্রাদ ধ্বংস করার জন্য কৃতসংকল্প। খাওয়া-দাওয়ার অভাবে, রোগে ছয়লক্ষ লোক মারা গেল। বোমা পড়ে নেভাস্কার বড় সড়কের ঘর-বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। দশ মাস লেনিনগ্রাদ বিচ্ছিন্ন, একমাত্র যোগ রক্ষা হচ্ছে শীতকালে লাগোডা হ্রদের জমাট বরফের উপর মোটরযান দিয়ে, আর গ্রীষ্মকালে তরল জলের উপর নৌযান দিয়ে। লেনিনগ্রাদ বহুকাল থেকে বহু শিল্পের কেন্দ্র; তাই এই রকম বিপদের মুখেও লোকে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করে লড়ছে। এই অবরোধের সময় যারা মারা যায়, তাদের সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসার প্রথম দিনই গিয়েছিলাম— সেকথা পূর্বে বলেছি।

হোটেলে ফিরতে বেলা আড়াইটা হল। লাঞ্চ খেয়ে উঠতেই দেখি লেনা ও ইরা এসেছে নোবিকোভার দূত হয়ে— তাঁদের বাসায় যেতে হবে। নোবিকোভার বাসায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, বারানিকফ সঙ্গে আছেন। বিরাট বাড়ির একতলায় কয়েকখানা ঘর পেয়েছেন এঁরা, পাড়াটা নূতন হয়েছে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন সবাই অর্থাৎ নোবিকোভা, তাঁর স্বামী ও সেই মেয়ে

দুটি। এঁদের এক ছেলে বছর চোদ্দ বয়স— তার খাওয়া পরে হবে বোধহয়। শুনলাম, বহুদিন কোন maid পান নি; এখন একজন বৃদ্ধাকে পেয়েছেন। তা না হলে সব কাজই নিজেদের করতে হয়। নোবিকোভার স্বামী না জানেন ইংরেজি, না বাঙলা। খুব আমুদে লোক— আমাদের সকলকেই ভোদকা খাওয়ালেন একটু করে। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন দেখি; খাব কত? আমি খুব সাবধানে খাই— ফলে দুই-একটা পদ মাত্র খেলাম। কিন্তু বাঙলা পড়ে পড়ে নোবিকোভার স্বভাবটা হয়েছে বাঙালী গিন্নীদের মত, এটা খাও, ওটা খাও; আরেকটু নাও, এটা বিশেষভাবে রুশীয়— ওটা ভাল লাগবে ইত্যাদি। অনেকক্ষণ খাওয়া চলল। হোটেলেও দেখেছি, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-গুজবটা বেশি চলে। অবশ্য সার্ভিং-এ দেরি হয় সেখানে। লেনিনগ্রাদেই আমরা দুটি রুশীয় বাড়ির মধ্যে আত্মীয়ের মত নিমন্ত্রণ খেলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে নোবিকোভা রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে চার অধ্যায়ের কয়েকটা জায়গার অর্থ বুঝে নিলেন; লেনা ও ইরাও বই এনেছিল, তাদের সঙ্গে অনুবাদ নিয়ে কথা হল। মিঃ নোবিকোভা রুশ ভাষায় তাঁর আনন্দ ও আবেগ প্রকাশ করলেন; তিনি লোকসাহিত্য নিয়ে কাজ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এঁদের ছেলেটি লাজুক মনে হল, অথবা বড়দের ভোজে ছোটদের দূরে রাখা হয়— জানি না।

আমি নোবিকোভাকে আমার সদ্য প্রকাশিত বই 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' উপহার দিলাম; কৃপালানী তাঁর ইংরেজি 'রবীন্দ্র-জীবনী' দিলেন আর বললেন, বড় বইখানা পাঠাবেন পরে।

হোটেলে ফিরলাম। আজই রাতে ১১-২৫ মিনিটে মস্কো যাত্রা। আসবার সময় সকালে লেনিনগ্রাদ স্টেশন দেখেছিলাম—

ছাড়বার সময় রাতে দেখলাম। লেনিনগ্রাদ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে লিফটের সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপঢৌকন দেওয়া হয়; বৃদ্ধা কি খুশি— চোখ ছলছল করে বলল— তোমরা তো এখানে আবার আসবে তখন কি আর আমি থাকব? বারানিকফ অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধার সেই সদাহাস্যময় মুখটা মনে আছে। তার জীবনে কত ঝড় গিয়েছে কে জানে— তার পিছনে বহু বৎসরের জীবনরেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

পৌনে এগারোটায় মোটর এল। জিনিষপত্র ওঠানো ব্যাপারে পোর্টারদের সাহায্য করতে কারও দ্বিধা হয় না। আমাদের মতো হাতগুটিয়ে 'কুলি' 'কুলি' আর্তনাদ করার রীতি নেই। আর করলেও কুলি পাওয়া যায় না সহজে ও সুলভে। কোন স্টেশনে সারিবাঁধা কুলি দেখি নি।

আমাদের মেল ট্রেন। ডাক উঠছে— তবে ঝুপঝাপ করে ফেলছে না লক্ষ্য করলাম। আমাদের চার বার্থের কামরা; একজন রুশী ভদ্রলোক ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে রেল কর্তৃপক্ষের এক মহিলা কর্মচারী এসে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে গেল। বুঝলাম, বিদেশী অতিথিদের আপনার মত থাকবার সুযোগ দেওয়ার জন্য এটা এঁরা করে থাকবেন। বুঝলাম, এটা অভিজাত যুগের রাজধানী ছিল।

১৮

মস্কো

২১ অক্টোবর ১৯৬২

মস্কোতে পৌঁছলাম সকাল সাড়ে আটটায় আন্দাজ; স্টেশনে সেরিব্রকোভ এসেছেন। একটু পরেই লিডিয়া হাজির — সেই কর্মতৎপরতা: মোটরগাড়ি না আসার জন্য ফোন করতে ছোটা। গাড়ি এল একটু দেরিতে। এবার আমরা উঠলাম বুদাপেস্ত হোটেলে। উক্রেইন হোটেল শহরের কর্মকেন্দ্র থেকে একটু দূরে— আমাদের গাইড বন্ধুদের যাওয়া-আসার অসুবিধা হত বুঝতাম। তাই এই নূতন হোটেলে ব্যবস্থা হয়েছে। আমি, কৃপালানী ঘর পেলাম তিনতলায়, দ্বিবেদী দোতলায়। এ হোটেল থেকে মহানগরীর কর্মব্যস্ত রাস্তা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা যায় না: উক্রেইন হোটেল থেকে মস্কো নদী দেখা যেত— বড় বড় রাস্তা আটতলা থেকে ছবির মত দেখাত।

স্নান করে লাঞ্চ খেয়ে তৈরি হলাম। কারপুশকিন এসে গেছেন, সেরিব্রকোভের কাজ আছে, তিনি বিদায় নিলেন, নিত্যসঙ্গিনী লিডিয়া আছেন। এবার চলেছি সোভিয়েতে আর্থিক উন্নতির স্থায়ী প্রদর্শনী দেখতে। গত বৎসর দিল্লীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছিল, তারই বৃহত্তর সংস্করণ। আমাদের অ্যাকাডেমির গাড়ি— ভিতরে যাবার অনুমতি পেলো—অফিস থেকে বোরিস পাস আনলেন। সোভিয়েতের অন্তর্গত পনেরটি রাষ্ট্রের পৃথক স্থায়ী প্যাভিলিয়ান; প্রত্যেকটি বাড়ি বহু যত্নে নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে নির্মিত হয়েছে। সমস্তগুলি দেখার সময় কোথা? তাই একবার উক্রেইন মণ্ডপে ঢুকলাম, একবার উজবেকিস্তান মণ্ডপে ঘুরে এলাম; যা দেখলাম—

বিস্ময়কর। এই কয় বৎসরের মধ্যে কৃষি, শিল্পে কি উন্নতি করেছে! ফলমূলের কি আকার! কাপড়-চোপড়ের কি বৈচিত্র্য! বিজ্ঞানের উন্নতি দেখবার জন্য আকাশবিহারী astronaut-দের ঘরে নিয়ে গেল। প্রথম স্পুটনিক— তাতে যে খরগোস, গিনিপিগ পাঠান হয়, তাদের মূর্তি করে রাখা আছে। প্রথম যে কুকুর যায়, পরে যে লাইকা যায়, তাদের মূর্তি রয়েছে। গাগারিনের আকাশযাত্রার ছবি টেলিভিশনে দেখান হচ্ছে। গাগারিন আকাশযাত্রার জন্য পোষাক পরছেন— সে পোষাকের কত ব্যবস্থা। কত বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে সে সব সাজগোজ পরাচ্ছেন। বাসে করে গাগারিন এলেন, যন্ত্রমধ্যে উঠলেন। যন্ত্রের কপাট পড়ল, তারপর যন্ত্র উঠল। গাগারিন ফিরে এসেছেন, তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে; লোকে পাগল ফুল দেবার জন্য। বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে, চোখে আনন্দাশ্রু; ছেলেমেয়েরা বাপকে পেয়ে কি খুশি। রেড স্কোয়ারে এঁদের তিনজনের সম্বর্ধনা হচ্ছে, ক্রুশ্চেভ স্বয়ং উপস্থিত।

অ্যাষ্ট্রনট-গৃহ থেকে লিডিয়া নিয়ে চললেন Electronics বিভাগে। কিছুই বুঝলাম না— কেবল দেখলাম নানাবিধ যন্ত্রপাতি। শুনেছি মানুষের brain-এ যে-সব কাজ হয়, অর্থাৎ মনে রাখা, ভুল ধরা, হিসাব করা প্রভৃতি— তা নির্ভুলে এবং অল্প সময়ের মধ্যে করবার শক্তি পেয়েছে এই নূতন যন্ত্রদানব। আজকাল চারদিকেই এই Electronics-এর আমদানী হচ্ছে, একশটা মানুষের কাজ দশটা মানুষ ও একটা কলে করবে। টেপ রেকর্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় স্টেনোগ্রাফারের ভাত উঠল। কারখানায় নূতন নূতন যন্ত্র আসছে— বলা হচ্ছে Rationalisation, অর্থাৎ বুদ্ধির কেরামতি দেখিয়ে লোক ছাঁটাই করে জিনিষের দাম কমাব। কিন্তু প্রশ্ন— এতগুলো লোক বেকার হল— তারা খাবে কি? এবং

তাদের কেনবার শক্তি নষ্ট হওয়াতে সমগ্রভাবে শিল্পের ক্ষতি হল কি না। অত সব ভেবে কি হবে। আপাতত প্রতিযোগিতায় আমরা তো দাম কমিয়ে মার্কেট দখল করব! এই ইলেকট্রনিকসের অতি-ব্যবহার একদিন পৃথিবীতে সেই সমস্যা সৃষ্টি করবে যা ইংলণ্ডে মিতশ্রমিক যন্ত্র হঠাৎ চালু হওয়ায় করেছিল। মানুষ সেদিন থেকে যন্ত্রের দাস, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সৃষ্ট জীব— তাকে আর আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না! একথা আমার নয়— একজন নোবেল প্রাইজপ্রাপক বিজ্ঞানীর।

লিডিয়ার খুব ইচ্ছা— আলো ও সঙ্গীতের সঙ্গে ইলেকট্রনিকসের কেরামতি দেখতেই হবে। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, তারপর অন্য লোকেরা এল। ঘর পূর্ণ হতেই দরজা বন্ধ ও কন্সার্ট শুরু হল। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সামনে পর্দার উপর (?) নানা রঙের খেলা আরম্ভ হল। বাজনার সুরটা কোন ইতালীয়ের দেওয়া, সেটা মন্দ লাগছিল না ; কিন্তু আলোর সঙ্গে তার যোগটা বুঝা গেল না। লিডিয়া মনে করে, এটা ভয়ানক আবিষ্কার। আলোর ও সুরের ছন্দ আছে— এটা সে বুঝাবার চেষ্টা করলো অনেক করে। অভিনবত্বের দিকে আকর্ষণ হওয়াটা স্বাভাবিক— অর্ধশতাব্দীর ট্রাডিশন তো মাত্র।

মোটরে করে সমস্ত প্রদর্শনীর উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, কেবলই মনে হচ্ছিল, ভারতের মধ্যে এরকম স্থায়ী প্রদর্শনী থাকলে কেমন হত? হয়তো প্রাদেশিকতার ও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার পাগলামি কিছুটা শমিত হত— পরস্পরকে দেখে ও জেনে।

হোটেলে ফিরে খেয়ে উঠতে বেলা তিনটা বেজে গেল। ক্লান্তি নেই। তখনই বের হতে হবে— প্যানারামা দেখতে। ব্যাপারটা

কি— নেপোলিয়নকে যে বোরোদিনের (Borodin) যুদ্ধে কুজিনোভ হারিয়েছিলেন, তার ছবির প্রদর্শনী। ছবির প্রদর্শনী আর কত দেখব— লেনিনগ্রাদে যা দেখেছি, মস্কোতে ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারিতে যে সব ছবি দেখেছি— ঐ সবই তো? যাক, যাওয়া যাক, ঘরে বসে কি করব? চল। কারপুশকিন, লিডিয়া চললেন আমাদের সঙ্গে।

আমি পূর্বে বলেছি, নেপোলিয়ন রুশ আক্রমণ করেন ১৮১২ সালে। যেদিন রুশীয়দের কাছে তাড়া খেয়ে তিনি মস্কো থেকে পালাতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই দিনটা স্মরণ করে অর্থাৎ উনিশে অক্টোবর— দেড়শ' বছর পরে উৎসব হয় মস্কোতে; লেনিনগ্রাদে থাকতে আমরা তার ছবি দেখেছিলাম। সেই দিনের স্মরণে এই প্যানারামা তৈরি হয়েছে। এক রুশ চিত্রশিল্পী একশ কুড়ি ফুট লম্বা ও বার ফুট চওড়া ক্যানভাসে বোরোদিনের সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটি এঁকেছিলেন। ছবিটার উপর দিয়ে অনেক ঝড় যায়, খানিকটা নষ্টও হয়ে গিয়েছিল; আধুনিক শিল্পীরা খুব যত্ন করে সেই বিরাট চিত্রটাকে মেরামত করেছেন। আমরা পৌছলাম একটা বড় কাঁচের বাড়িতে। কী মসৃণ মেঝে; ভয় হয় পিছলে না পড়ি। ওভারকোট রেখে এগোতেই দেখা হল ডিরেক্টরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করানো হল। তিনি পূর্বে মিলিটারীতে কাজ করতেন— এখন অবসর নিয়ে এখানকার কর্তা হয়ে আছেন। আমাদের নিয়ে ডিরেক্টর স্বয়ং চললেন একটা চত্বরের উপর— ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের মত জায়গা। সেই জায়গাটায় উঠে হকচকিয়ে গেলাম। কোথায় মস্কো শহর— এ তো যুদ্ধক্ষেত্র। যেদিকে তাকাই, যুদ্ধের ছবি! ডিরেক্টর শুনলেন যে আমাদের তোলস্তয়ের War and Peace পড়া; খুব উৎসাহিত হয়ে রণাঙ্গনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে

লাগলেন। ঐ দেখুন সেনাপতি কুজিনভ—ঐ দেখা যাচ্ছে—নেপোলিয়ন সাদা ঘোড়ার উপর চড়ে, ঐ তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মার্শাল নে। ঐ ফরাসীরা হেরে পালাচ্ছে; ঐ ঘোড়ার গাড়িতে আহত সেনাপতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্রামে আগুন লেগেছে—ধোঁয়া উঠছে। অচল ছবি যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে। এ রকম চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার দেখি নি। লেনিনগ্রাদে পুতুল নাচ দেখতে গিয়ে চোখের উপর চালাকির খেল দেখেছিলাম—ছোট ছোট পুতুলগুলো স্টেজে দেখাচ্ছিল আসল আকারের মানুষ, গরু, কুকুর। এখানেও সেই চোখের ভ্রম। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেখা হল। তার পর নেমে এলাম নীচে। আবার শহর দেখা গেল—সেই জনতা—সেই গাড়ি-বাস-এর চলাচল। অফিসে গেলাম, আমাদের মতামত লিখতে হল খাতায়। অনেক ফোটো উঠেছে ইতিমধ্যে। দুটি রুশীয় ছেলে আমায় দেখে খুব কৌতুক বোধ করছিল; আমি তাদের কোলের কাছে টেনে নিলাম। ফোটোগ্রাফার দেখছি—একটা ফোটো তুলে নিলেন—এক বৃদ্ধ ভারতীয় দুটি রুশীয় শিশুকে আদর করছেন—প্রাচীন ভারত ও নবীন রুশের প্রতীক যেন আমরা।

বের হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনি যেতে হবে সিনেমায়; টিকিট করা আছে। রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সি পেলাম—তাই ঠিক সময়ে থিয়েটার হলে পৌঁছতে পারা গেল। ক্লোকরুমে ওভারকোট টুপি রেখে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেলাম। ভাগ্যে দেরি হয় নি।

থিয়েটার হচ্ছে তোলস্তয়ের Living Corpse বা জ্যান্ত মড়া নাটকের। আমাদের খুব ভাল লাগল। রুশ ভাষা সত্ত্বেও অভিনয় বুঝতে অসুবিধা হল না, কাহিনীটি জানা ছিল বলে। অ্যাক্টিং

খুব ভাল লাগল ; সংঘাতের দৃশ্যগুলি মনকে স্পর্শ করে। কাহিনীর নায়ক সত্যাই মরে প্রমাণ করল যে ইতিপূর্বে সে মৃত্যুর অভিনয় করেছিল ! রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃতের 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'।

১৯

মস্কো-য়াসনাপোলিয়ানা

২২ অক্টোবর, ১৯৬২

আজ তোলস্তয়-এর জন্মভূমি Yasnapolyana দেখতে যাব। ভোরে উঠেছি, বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কনকনে হাওয়া বইছে। বের হবার দিন নয়, তবুও যেতে হবে। বোরিস ও লিডিয়া এসেছেন— অ্যাকাডেমির গাড়ি আসতে দেরি করছে। লিডিয়া ফোন-এ যাচ্ছে বার বার। গাড়ি এল সাড়ে ন'টায়, বের হতে হতে পৌনে দশটা হল; মস্কো থেকে দুই শত কিলোমিটারের বেশি পথ অর্থাৎ কলকাতা থেকে আসানসোল।

মহানগরী থেকে বের হলাম, কিন্তু বহুদূর টুকরো টুকরো শহর পড়ছে পথে। কুঁড়ে ঘর, বাসের অযোগ্য বাড়ির বদলে মানুষের থাকবার মত বড় চার-পাঁচ-ছয়তলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মানুষকে ক্রমেই খাঁচায় পোরা হচ্ছে, মাটির কাছে যে মানুষ ছিল— যে-শিশু মাটিতে গড়িয়ে মানুষ হতো, শহরে শহরে তারা এখন খাঁচায় বাস করছে। তবে একটা জিনিস মস্কো ও লেনিনগ্রাদে লক্ষ্য করলাম— অসংখ্য পার্ক সুন্দর করে সাজানো— শিশুরা খেলা করছে সেখানে। কলকাতায় যেখানে যতটুকু জমি ছিল সর্বত্র বাড়ি উঠছে— শিশু ও বালকদের খেলবার জায়গা রাস্তা ও ফুটপাথ! ভাবীকালের মানুষদের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা বোধ হয় কোনো সভ্যদেশে নেই!

চলেছি; গাড়িতে বেগ দিতে পারছে না, রাস্তা ভিজে, পাছে গাড়ির চাকা পিছলে যায়। পথের ধারে বিজলী বাতির পোল ও তার— বাড়িতে বাড়িতে টেলিভিশনের দাঁড় খাড়া। একক বাড়িগুলি মনোরম নয়; এসব রাষ্ট্রায়ত্তে এখনও আসে নি।

ঘোড়ার গাড়িতে কপি, তরমুজ চলেছে; বেশির ভাগ চলেছে শহরমুখো বড় বড় ট্রাকে। রাস্তা সোজা, বহুদূর দেখা যায়; দু'পাশে মাঠ; কোথাও বন, বার্চ গাছ বেশি, অন্যান্য গাছও আছে। দূরে গভীর অরণ্যের মত দেখা যাচ্ছে। বসতি আবার— ছোট গ্রাম, দরিদ্রের বাস— হাঁস-মুরগী চরছে পথের ধারে। একটা মাঠে অনেকগুলি গাই গোরু— জানি না সেটা যৌথ বাথান কি না। দুটি লোক ঘোড়ায় চড়ে চলেছে— সঙ্গে একপাল গোরু— চরাতে না মারতে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। একটা শহর পেলাম, বড় বড় বাড়ি, ট্রাম, বাস, দোকান পাট, সিনেমা, থিয়েটার পেরিয়ে চলেছি। ওকা নদী ঐ তো— নৌকা চলছে। এই নদীতে তো মস্কো নদী পড়েছে— আবার এগিয়ে পড়েছে ভল্গায়। টুলা (Tula) শহরে এলাম— এটা একটা জেলার সদর; মস্কো থেকে আমরা প্রায় দেড়শ কিলোমিটার এসে পড়েছি; এ শহরের খ্যাতি শুনেছি— সামোভার-কেতলি ও কামান বন্দুক করার জন্য। জার বোরিস গডুনোভ এখানে সব প্রথম বন্দুক কামানের কারখানা তৈরি করান। ইনি মস্কো ক্রেমলীনে ঘণ্টাঘর নির্মাণ করান (১৬০০); তখন ভারতে ফতেপুর সিক্রী, সিকান্দ্রা নির্মিত হয়ে গেছে।

টুলায় এসে কোনদিকে য়াসনাপোলিয়ানায় যেতে হবে আমাদের কেউ জানে না। বোরিস, লিডিয়া বা ড্রাইভার এ পথে কখনো আসেন নি। কৃপালানী রেলে এসেছিলেন— পথ বাতলাতে পারছেন না। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে কোন পথিককে 'তাবারিশ' বলে সম্বোধন করছে, পথ জেনে নিয়ে চলছে আবার।

Yasnapolyana এলাম: ছোট শহর। বড় বড় ইমারত শুরু হয়েছে, বড় একটা আবাসিক বিদ্যালয় দেখা যাচ্ছে। গাড়ি এসে থামল একটা রেস্তোরাঁর সামনে— এখানে হোটেল নেই। তখন

বেলা দুইটা। রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম, ওভারকোট প্রভৃতি রেখে হাত-মুখ ধুলাম; কিন্তু প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্নের জন্য কাদা ঠেলে অনেকখানি যেতে হল; এবং যে জায়গাটায় এলাম, সেখান থেকে বের হয়ে আসবার জন্য যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করলাম। বুঝলাম, সভ্যতার হাত এখনও সর্বত্র পৌঁছয় নি; অথবা একদল মানুষকে নোংরা জিনিস ঘাঁটবার জন্য ব্যবস্থা পাকা হয় নি।

রেস্তরাঁর খাওয়া ভালই লাগল; বুদাপেস্ত হোটেল থেকে নিন্দনীয় তো নয়ই। মেয়েরাই সার্ভ করছিলেন। এখানে মদ দেয় না; তাই কৃপালানী, বোরিস শুধু বীয়ার খেয়েই তৃষ্ণা মেটালেন। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। আমরা আমাদের ড্রাইভারকে ডেকেছি একসঙ্গে খেতে, সে লোকটি বীয়ার স্পর্শ করল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি মদ খান না? বোরিস বললেন, মোটর গাড়ি যখন চালায়, তখন চালকদের পক্ষে মদ খাওয়া নিষেধ। পথে মিলিশিয়াম্যান বা পুলিশ আছে, তারা হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার মদ খেয়েছে কিনা পরখ করে, মুখ দিয়ে 'হা' শব্দ করতে বলে; মদের গন্ধ পেলেই সর্বনাশ, তার ট্যাক্সি বা গাড়ির নম্বর টুকে পাঠিয়ে দেবে উপরওয়ালার কাছে। মদ খেয়ে গাড়ি চালানো সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনো নিয়ম নেই। একদিন শেওড়াফুলি যাচ্ছি, একটা সভার আহ্বান। মোটরে যাচ্ছি। পথে দুই ছোকরা গাড়ি চালিয়ে আসছে— আমাদের গাড়ির গা ঘেঁষে ধাক্কা মারল। দুই গাড়ি থেমে গেল। আমি নেমে ধাক্কাদার গাড়ির আরোহীকে ধরলাম— মুখ দিয়ে মদের গন্ধ ছাড়ছে। পুলিশে দেবার জন্য জনতাকে বললাম। কাকুতি-মিনতি করতে ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যস্থলে চললাম। এরা নতুন পয়সা পাওয়া অভিজাত— সকালে ফোঁটা নেয়, রাতে ক্লাবে যায়— এরা দুকুল সামলে চলে।

রাতে যারা ট্রাক চালায়, তাদের কথা সুবিদিত। গুরু অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তামাকটি খেয়ো না বাপধনরা। কিন্তু মদ খেয়ো না— এ কথা বলতে তাঁর ভদ্রতায় বোধহয় বেধেছিল। যারা তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে, তারা কি মদ খেতে পারে? তাই ও-নামটা করেন নি। তাই মদ সম্বন্ধে এমন উদার তারা। মত্ত চালকের গাড়িতে চড়েছি। অবশ্য বেশির ভাগই ভদ্র— এ কথা বলবই।

লিডিয়া তোলস্তয়ের জমিদারী বা এস্টেটের মধ্যে গিয়ে জেনে এলেন, গাড়ি নিয়ে আমরা ভিতরে যেতে পারি কি না। এসে বললেন, গাড়ি নিয়ে আমরা যেতে পারি, আর গাইড অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। বুঝলাম, আমরা যে এখানে আসব, সে খবর আগেই এসে গিয়েছে।

গাইড ভদ্রলোকের নাম পি. নিকোলাই; তিনি সুশিক্ষিত, তোলস্তয়ের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। তোলস্তয়কে তিনি দেখেন নি; তাঁর জন্ম হয় ১৯১০এ— যে বৎসর তোলস্তয় মারা যান। তোলস্তয় এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। সে বাড়ি নেই, তবে যেস্থানে বাড়িটা ছিল, সে স্থানটি আমাদের দেখান হল। তিন শত হেক্টার বনভূমি ও জমিজমার মধ্যে কাউন্টের বাড়ি; অরণ্যের মধ্যে আরণ্যকের বাস।

দোতলা বাড়ি; ঢুকবার মুখে জুতোর উপর কাপড়ের জুতো পরতে হল। নিকোলাই আমাদের জামায় তোলস্তয়ের মূর্তি খোদাই ব্যাজ এঁটে দিলেন। ব্যাজ এঁটে দেওয়া— এটা সোভিয়েতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই আছে। স্মারক চিহ্ন হিসাবে খুব ভাল। বাড়ির যেখানে যা যেমনভাবে ছিল, সেটা রাখবার চেষ্টা হয়েছে। কত লোক দেখা করতে আসত— শিল্পী সাহিত্যিকই নয়,

তাঁর প্রজারা আসত— সুখ-দুঃখের কথা বলতে, উপদেশ নিতে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর এস্টেটের অনেকখানি অংশ প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন।

বেশ বড় লাইব্রেরী, হাজার চব্বিশ বই—নানা ভাষায়। তোলস্তয় নিজে জানতেন তের-চোদ্দটা ভাষা। আরবী ও তুর্কী শিখেছিলেন যৌবনে, চর্চার অভাবে সেটা ভুলে যান পরে। বই-এর মধ্যে গান্ধীর জীবনী Doke-এর লেখা চোখে পড়ল। এই য়াসনাপোলিয়ানাতে দেখা করতে এসেছেন তুর্গেনিভ। উভয়ের মধ্যে দেখা হয় পিটার্সবার্গে, প্যারিসে ; পত্র বিনিময় হয়েছে সাহিত্য নিয়ে। মতভেদ চূড়ান্ত থাকা সত্ত্বেও উভয়েই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। য়াসনাপোলিয়ানা তখন (১৮৭৮) বহুজনপূর্ণ; জমিদার বাড়ি আত্মীয়কুটুম্বপূর্ণ— অতিথি অভ্যাগত লেগেই আছে।

দোতলার ঘরে তোলস্তয়ের এবং তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ের প্রতিকৃতি রয়েছে। ১৮৮৭ সালে শিল্পী রেপিন (Repin) এলেন এঁর ছবি আঁকতে। দুটো ছবি চিত্রিত করলেন— একটা ঘরে বসে লিখছেন, অপরটি হেলান চেয়ারে আরাম করছেন। বসা চিত্রটা ঘরে দেখলাম, অপরটি দেখেছিলাম ত্রেতিয়াকভ চিত্রশালায়। রেপিন তোলস্তয়কে লাঙ্গল-ঠেলা অবস্থায় দেখবার জন্য মাঠে মাঠে ঘুরে তাঁর স্কেচ করে নেন, সেটা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি ; যার মধ্যে তোলস্তয়ের প্রকৃতিও ফুটে উঠেছে— সভ্যতার উপদ্রব থেকে উদ্ধার পাবার নিরন্তর চেষ্টার প্রতীক এই ছবি। এক আত্মীয়হীন বৃদ্ধার জমি চাষ দিতেন—আত্মীয়, বন্ধুদের বিরাগভাজন হয়েও। তোলস্তয়ের জীবনের কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। মোটামুটিভাবে সকলেই জানেন যে তিনি চার্চের বা গভর্নমেণ্টের শাসন বিষয়ে তীব্র সমালোচক ছিলেন। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি

অর্জন তিনি পছন্দ করতেন না। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ভল্টেয়ার যেমন তাঁর রচনা দিয়ে ফরাসী জাতির মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে যান, রুশ বিপ্লবের অনেকখানি প্রস্তুতির আয়োজন দেখতে পাই তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে। তবে তাঁর জীবনে ছিল দুটো প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ভাবের টানাটানি। মন বলে, এটা কর, দেহ বলে, না; দেহ বলে, এটা মধুর, মন বলে, না; এই ছিল তাঁর সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ছিল ঘরের লোকদের সঙ্গে। যে রমণীকে তিনি চৌদ্দটি সন্তানের জননী করেছিলেন, তাঁকে তিনি মৃত্যুকালে কাছে আসতে দেন নি। আত্মখণ্ডন চরমে উঠল, যেদিন তিনি য়াসনাপোলিয়ানার বাড়ি ছেড়ে রাত্রিবেলা ডাক্তার ও ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। পথে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অস্টপোবো (Astopovo)— বর্তমানে লিও তোলস্তয়-নামে ছোট একটা রেল স্টেশনে এই মহাপ্রাণের মৃত্যু হয়। ছেলেমেয়েরা সন্ধান পেয়ে আগেই এসে যায়; স্ত্রী ট্রেনের কামরায় আছেন, দেখা হল না।

মৃতদেহ বাড়িতে এনে যে ঘরে কফিনে রাখা হয়েছিল, সে ঘরটি দেখলাম। অসংখ্য লোক দেখতে আসে এই মহাপুরুষকে। বাড়ির একটা দিকে দরজা ভেঙে দেওয়া হয়— সেদিক দিয়ে ঢুকে কফিন দেখে অন্যদিক দিয়ে লোকে বের হয়ে যায়।

বাড়িতে কোথায় বসে কোন বই লিখেছিলেন, কোন ঘরে কি ভাবে থাকতেন— সব দেখে চললাম তাঁর কবর দেখতে। খ্রীষ্টান পাদরীরা বলেছিল, ঐ নাস্তিককে তাদের চার্চে কবরিত হতে দেবে না। তোলস্তয় নাস্তিক ছিলেন না; তাঁর আন্তরিক ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা, তাঁর কঠোর নীতিজ্ঞানের গভীরতা বুঝবার শক্তি সাধারণ ধর্মান্ধদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বুদ্ধিযোগে বাইবেলের বহু বিরুদ্ধ

ঘটনা ও উক্তির সমন্বয় করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন— সেটা গোঁড়াদের কাছে অগ্রাহ্য হয়; বাইবেলের বাণীর মধ্যে হস্তক্ষেপ যে করে, সে তো পাষণ্ড। আর গভর্নমেণ্ট মনে করতেন লোকটা বিপ্লবের উস্কানী দেয়— সাহিত্য, আর্ট সম্বন্ধে যে সব মত দেয় তা স্বীকার করলে সমাজ-সংসার উচ্ছন্ন যাবে; তাই তোলস্তয়ের অনেক বই দেশে ছাপবার আগে বিদেশে প্রকাশিত হতো।

তোলস্তয়ের সমাধিক্ষেত্র দেখতে চললাম— বৃদ্ধ বার্চ অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ; তুষার লেগে এদের গায়ের রঙ সাদা হয়ে গিয়েছে। শুনলাম হিটলারের নাৎসীবাহিনী এই অঞ্চল দখল করে এই বাড়ির ও অরণ্যের অনেক ক্ষতি করেছিল। অরণ্যের পথে চলেছি, চলেছি, কি গম্ভীর, কি মহান। একটি বার্চ গাছের তলায় ঘাসে ঢাকা কবরতলে মহাপুরুষের দেহ সমাধিত রয়েছে। আমরা সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আসবার সময় নিকোলাইকে বললাম, এখানকার দুটি ছোট ফুল ও বার্চের একটি শাখা পেতে পারি কি? তিনি সানন্দে তা দিলেন। সেগুলি সযত্নে রেখেছি— বন্ধু-বান্ধবরা চেয়েও নিয়েছেন— তীর্থক্ষেত্রের স্মারক-চিহ্ন বলে।

মনে পড়ল মস্কোর লেনিন মসোলিয়ম, দিল্লীর রাজঘাটে গান্ধীর উদ্দেশে নির্মিত সমাধিক্ষেত্র। রাজঘাট একবার দেখেছি— দ্বিতীয়বার গিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় নি। সেখানে গেলেই মনে পড়ে সাবরমতীর ঘর, সেবাগ্রামের কুটির; নেকেড ফকিরের সমাধি নিরাভরণ হলেই মানাত। তাঁর কি এই রাজসিক সমাধিক্ষেত্র শোভা পায়? গান্ধীর মৃতদেহ নাকি কামানের গাড়িতে (Gun carriage) করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়! লেনিন মসোলিয়মে লেনিনের দেহ দেখে মনে হয়েছিল— মানুষের নশ্বর দেহ তো একদিন

ধ্বংস হবেই— তবে এ কিসের মোহ ? মানুষ পুজোর জন্য পুতুল ও খেলনা চায়। চাই গুরু, অবতার— শাসনের জন্য ও দেশ ভাঙাগড়ার জন্য চাই রাজা, সম্রাট, প্রেসিডেন্ট, ডিক্টেটর! তোলস্তয় ছিলেন সকল প্রকার শক্তিবাদের মূর্তিমান প্রতিবাদ— কি রাজকীয়, কি ধর্মীয়— তাই চার্চ তাঁকে তাদের সমাধিক্ষেত্রে স্থান দেয় নি। তাঁর দেহ অরণ্যের মধ্যে ধরিত্রী-বক্ষে সমাহিত হয়।

মস্কো ফিরলাম প্রায় রাত দশটায়— ফিরতে চার ঘণ্টা মোটরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে বসে; গল্প-গুজব-হাসি, ঠাট্টার মধ্যে গুরুগম্ভীর আলোচনাও চলছিল। বোরিস বাংলা জানে শুধু না, ভাষার মধ্যে রসিকতা বোঝে এবং করতেও পারে।

বুদাপেস্ত হোটেলে পৌঁছে খাবার ঘরে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলে— লোকে প্রচুর মদ খায়। আমাদের তিনটা টেবিলের পরে দেওয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলে এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ বসে কি মদটাই গিলছে। শেষকালে দেখি, মেয়েটার এমন নেশা হয়েছে যে, পুরুষটাকে চুম্বন করবার জন্য বার বার এগিয়ে যাচ্ছে। জানি না তারা কোন শ্রেণীর বা কোথাকার লোক। নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে। খেয়ে বের হয়ে এসেছি; লাউঞ্জে এক বিরাটকায় রুশ ইঙ্গিতে ডাকলে, বুঝিয়ে দিল— ভিতরে এস। কৃপালানী সঙ্গে ছিলেন— গেলাম ভিতরে। বোরিস তখন হিসাবপত্র মেটাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম। ইতিমধ্যে একজন মেয়ে সেবিকা অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠল— লোকটা মাতাল, লোকটা মাতাল। বিদেশীদের এভাবে আহ্বান করার জন্য তারা সকলেই লজ্জিত। বুঝলাম, আমার দেশে অতিভক্তের দল ভুলে ভ্রান্তিতে ভরা মানুষে গড়া ধরণীর বাস্তব রূপটা দেখতে পান না— বাস্তবতাই মানুষের স্বর্গ! অলীক স্বর্গ কল্পনার প্রয়োজন কী?

২০

মস্কো

২৩ অক্টোবর ১৯৬২

সকালবেলায় স্নানাদি করে কৃপালানীর ঘরে গেছি, গল্পসল্প হচ্ছে। এমন সময়ে টেলিফোনে কৃপালানী কার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখছি. কৃপালানীর মুখ অত্যন্ত পাংশু হয়ে আসছে; বার বার বলছেন- 'আই সি, আই সি।' ফোন রেখে বললেন, 'বিশ্রী খবর। চীন ভারত আক্রমণ করেছে; ভারতকে হটে আসতে হচ্ছে।' এই অতর্কিত হামলার কথা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই তো কয়বৎসর আগে চু-এন লাইকে বিশ্বভারতী বিশেষ সমাবর্তন করে উপাধি দান করলেন। কতদিন শুনলাম, 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' আওয়াজ। বই লিখেছি— ভারতের সঙ্গে চীনের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, রুশ, চীন ও ভারত এককালে পৃথিবীর নিয়ন্তা হবে। কিন্তু বারাঙ্গনার ছলকলা ও রাজনীতিকদের মিতালিপনা— একই জাতের মুখোস। চীন বোধ হয় চায় না শরিকী সম্মান— এশিয়ার সর্বময় কর্তা হতে চায় সে একাই— যেমন একদিন চেয়েছিল জাপান।

জাভার বান্দুঙ সম্মেলনে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন 'পঞ্চশীল তত্ত্ব'। সংবাদটা শুনে মনে হল— এতকাল শুনে আসছি কম্যুনিস্টরা কখনও অন্যদের দেশ আক্রমণ করে না। কথাটা কি সত্য? তিব্বতের সঙ্গে চীনের যোগ কোথায়? না ভাষায়, না সংস্কৃতিতে, না সভ্যতায়। লিপি আলাদা— সমাজ-ব্যবস্থা পৃথক; তবুও তারা দাবি করে দখল করে বসেছে সে দেশ। কবে কোন শতাব্দীতে বিদেশী মংগোলরা যেমন চীনের সম্রাট হয়, তেমনি তিব্বতের উপর

আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সুবাদে আজও সে তিব্বতের উপর আধিপত্য দাবীদার! শান্তির কথা কত শুনেছি। মাওৎসু তুঙ বলেছিলেন, তাঁর উদ্যানে শত পুষ্প ফুটবে। ভাবছি— এই কি চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ।

শুনেছিলাম মার্ক্স-লেনিন-স্তালিনের সমাজতন্ত্রবাদে ধর্মরাজ্য গড়ে উঠবে। হজরত মহম্মদ ও খলিফারা ভেবেছিলেন— দুনিয়ার সব ভেদ-বিভেদ দূর হয়ে যাবে এক ধর্ম গ্রহণ করলেই। হল না তা। হজরতের দৌহিত্ররা মারা পড়লেন স্বধর্মীদেরই হাতে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হতে না হতেই ট্রটস্কিকে দেশছাড়া হতে হল, দূর দেশে আততায়ীর হাতুড়িতে মাথার খুলি চূর্ণ হল। সেই শক্তিমদের মত্ততা কি কোথাও কমছে? চীনের ভারত আক্রমণ ও এই আক্রমণ সম্বন্ধে সোভিয়েত রুশের এই নীরবতা— দুটিতেই মর্মাহত হলাম। সোভিয়েত কাগজ তখন কিউবার খবরে পূর্ণ— ভারত সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। মনে অনেক কথা উঠছে, আমরা তিনজনেই চুপচাপ ভাবছি 'একেই কি বলে সভ্যতা!'

কারপুশকিন ও লিডিয়া এলেন। গাড়ি প্রস্তুত, যেতে হবে পীপল্‌স্ ফ্রেণ্ডশীপ য়ুনিভার্সিটি। এই প্রতিষ্ঠানের নাম এখন প্যাট্রিস লুমুম্বা। ইনি কংগোর বীর— যাঁকে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা হত্যা করে। কংগোলী নেতা লুমুম্বা সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জি মুচড়ে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর দেশে। স্বার্থে বেধেছিল সেই সব লোকদের— যারা এখন পর্যন্ত পেশাদার হয়ে, বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সেজে, অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টায় আছে। সেই ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিলেন লুমুম্বা। সোভিয়েত-রুশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। গাইড আমাদের দেখালেন— ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি,

জিওলজি, বায়োলজির ক্লাশ— ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নানা জাতির— আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার। পরিচয় নিলাম অনেকের; আফ্রিকার অসংখ্য উপজাতি; কেউ কারও ভাষা বোঝে না। কথা বলে ইংরেজি বা ফরাসীতে। এখন রুশ ভাষা শিখছে ও সেটাই হয়ে আসছে চলতি কথার মাধ্যম। শান্তিনিকেতনে একসময়ে কয়েকটি আফ্রিকার ছাত্র ছিল, তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতো ইংরেজিতে। এইটুকু লিখেই মনে হলো— আমরা কি করি? খবর নিয়ে জানলাম ঘানা, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, মালি প্রভৃতি সমস্ত নূতন রাষ্ট্র থেকেই ছাত্রছাত্রী এসেছে। মরিশাস থেকে যে ছাত্রটি এসেছে, সে আসলে ভারতীয়, বিহারে বাড়ি ছিল। তিন পুরুষ পূর্বে তারা মরিশাসে গিয়েছিল ইক্ষুক্ষেতে কাজ করতে। তার মাতৃভাষা ফরাসী, তবে হিন্দী বলতে পারে এবং এখানে রুশী শিখেছে। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম ছয় মাস ভাষাটা রপ্ত করতে হয়। ভাষা শেখাবার জন্য রেকর্ড আছে; দেখলাম কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনছে। বড় একটা ঘরে অনেক ছাত্রছাত্রী বসে নিবিষ্ট মনে ভাষা শিখছে। ভাষা না শিখলে তাদের কোন উপায় নেই; সমস্ত অধ্যাপনা হয় রুশভাষায়, বই সমস্ত রুশভাষায় লেখা। রুশভাষায় যে কি বিরাট বিচিত্র সাহিত্য লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে, তা এদেশের লাইব্রেরী না দেখলে ধারণা করা যায় না, লেনিন লাইব্রেরীর রিপোর্ট থেকে কিছুটা জানা যায় অবশ্য।

অধ্যক্ষ মিঃ এরজিন-এর ঘরে গেলাম। ভারতীয় কয়টি ছাত্রকে ডেকে পাঠানো হল। তাদের মধ্যে একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে; তার সঙ্গে পূর্বে দেখা হয়েছিল হাউস অব ফ্রেণ্ডশীপে। একটি ওড়িয়া ছাত্র, অপরটি শিখ। এই প্রতিষ্ঠানের

ইতিহাস অধ্যক্ষ বললেন সোভিয়েত-রুশের নানা কমিটি থেকে প্রস্তাব হয় যে, পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটা বিদ্যায়তন স্থাপন করা দরকার। সোভিয়েত-আফ্রো-এশিয়ান-দৃঢ়-মিলন-কমিটি, বিদেশের সঙ্গে সখ্য ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অপর একটি কমিটি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-- এঁরাই উদ্যোক্তা হন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ষাটটি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। সেদিন ক্রুশ্চেভ যে কথা বলেছিলেন, তা আমাদের ছাত্রদের স্মরণ করে রাখবার মত। তিনি বলেছিলেন ঃ

"Study diligently, do not waste a single day, use every opportunity to gain extensive knowledge, to study science and technology."

অত্যন্ত সাধারণ কথা— ছাত্ররা সর্বদাই শুনছে, কিন্তু উপদেশ শুনতে যত উৎসাহ, উপদেশ মত কাজ করতে ততটাই অরুচি!

অধ্যক্ষ ভারতীয় ছাত্রদের প্রশংসা করলেন ; বললেন, তারা পড়াশুনায় খুব serious ! মুশকিল হয়েছে কতকগুলি আফ্রিকান ছাত্রদের নিয়ে। তারা এই নরনারীর সমান অধিকারের দেশে এসে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেশে এবং অনেক সময় বিবাহও করে। এদের অসুবিধা হবে দেশে ফেরবার সময়। রুশীয় মেয়েরা পাসপোর্ট যদি না পায়, তবে কি হবে। সরকারকে বোধ হয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। গতবৎসর আফ্রিকান ছাত্রদের সঙ্গে বেশ অশান্তিকর পরিস্থিতি হয়েছিল।

ছাত্ররা এখানকার হস্টেলে থাকে— সব জাত, সব ধর্ম, সব বর্ণের ছাত্র— এক সঙ্গেই। অর্থাৎ শাদা রুশীয় ও লাল ইণ্ডিয়ান, কালো

নিগ্রো ও আধা-পীত জাভানীর থাকা-খাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না। নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সবাই আছে পাশাপাশি। খাওয়া-দাওয়া একত্র; দেখলাম সে-সব। নিজেরা রেকাবি নিয়ে খাবার আনছে। শুনলাম খাওয়ার খরচ পড়ে মাসে পঞ্চাশ-ষাট রুবল। কাফেতেরিয়া থেকে কিনে খেতে পারে ইচ্ছামত। তবে এখানে মদ চলে না। আমরা অধ্যক্ষের ঘরে লাঞ্চ খেলাম, সেখানে লেমনেড ছাড়া কিছু ছিল না। তবে ছেলেরা সিগারেট খায় এবং যেখানে-সেখানে ফেলে, তাও দেখলাম। প্রাচ্য অভ্যাসটা যায় নি এখনো।

একবার একটা integration অর্থাৎ মিলন সভায় একটা প্রস্তাব করে বেয়াকুফ বনেছিলাম। স্কুল, কলেজের হিন্দু, মুসলমান ছেলেরা পৃথক বোর্ডিং-এ থাকে। হিন্দুপ্রধান শহরে মুসলমানদের বোর্ডিংগুলি প্রায়ই তুলনায় খাটো। আমি বলেছিলাম, পড়ছে একসঙ্গে, হাটবাজার করছে একসঙ্গে. ট্রেনে-বাসে চলছে একসঙ্গে— আর একসঙ্গে থাকতে দোষ কি? উভয় ধর্মের লোকই ফোঁস করে উঠলেন— হিন্দুর হিন্দুয়ানী ও মুসলমানের মুসলমানী নষ্ট হবে! বললাম, একসঙ্গে থাকবে— দুটো খাওয়ার ঘর থাকবে: সেখানে অখাদ্য খেতে কেউ পাবে না। অর্থাৎ হিন্দুর পক্ষে যা অখাদ্য তা মুসলমান হস্টেলে চলবে না, আর মুসলমানের পক্ষে যা হারাম তা হিন্দুর রান্নাঘরে নিষিদ্ধ।···সকলের মনের ভাব, এসব সম্ভব নয়— এটা শান্তিনিকেতনেই হতে পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে যারা এটা পালন করে, তারা ভারতীয়—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সবই আছে।

মনে আছে এক নামকরা মুসলমান ভদ্রলোকের ছেলে মাদ্রাসায় বরাবর পড়েতন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে প্রথম হিন্দু ছাত্র দেখেন।

কোন সময়ে কলকাতায় এক কলেজে ছোট কাজ করতাম—তবু ছাত্রদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল। একটি মুসলমান ছেলে প্রায়ই আসত আমার ঘরে। তাকে শুধোই— কোথায় থাক। সে বললে, মুসলমানদের জন্য বিশেষ হস্টেলে। আমি বললাম, ভালই তো, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোন কষ্ট হয় না। ছাত্রটি বললে, বলেন কি? সর্বনাশ হচ্ছে। কাছাকাছি বাস করলে পরস্পরকে জানতে, বুঝতে, ভালবাসতে পারতাম— সে-সব তো আর হয় না। কথাটা শোনা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। মনে আছে এখনও।

মোট কথা, সোভিয়েত-রুশ জাত-পাত তোড়ে জাতে জাতে জোড় লাগাবার চেষ্টায় আছে।

লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ফোটো তোলা হল— সাদা, কালো, হলদে, কটা মিশে গেল— এই মহামানবের সাগরতীরে।

এখানকার ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুই হাজার; শুনলাম ছিয়াশিটি দেশ থেকে তারা আসছে। ছাব্বিশটি লাতিন আমেরিকান দেশ থেকে প্রায় পাঁচ শত, উনত্রিশটি আফ্রিকান রাষ্ট্র থেকে চার শত পঞ্চাশ, মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে তিন শত, এশিয়ান দেশগুলি থেকে পাঁচ শত। ইন্দোনেশিয়া থেকে সবচাইতে বেশি ছাত্রছাত্রী— দুই শত। এরা ধর্মে মুসলমান; এখানে এসে তাদের ধর্মভাব উত্তেজিত হবার কোন ভরসা নেই। জানলাম, য়ুরোপীয় দেশ থেকে ছাত্র নেওয়া হয় না; অনগ্রসর দেশ থেকে দরিদ্র ছাত্র সংগ্রহ করে তাদের শিক্ষিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই সব দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা প্রীতি, যে-দেশ থেকে এত আর্থিক সহায়তা আসছে, তাদের অনুকূলে যাওয়াই

স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য এইসব ছাত্ররা সোভিয়েত সামাজিক, আর্থিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেই এবং নিজ নিজ দেশে সেই সব ভাবনা নিয়ে ফিরে যাবে। এটা কি খুব অস্বাভাবিক? মার্কিন মুলুক থেকে যারা ফুলব্রাইট এবং হাজার রকমের বৃত্তি পেয়ে, বিদ্যার্জন অথবা দেশ ভ্রমণ করে ফিরে আসছেন— তাঁরাও তো মার্কিনী ভাষা রপ্ত করে, মার্কিনী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও তাদের Economics-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লুমুম্বার কর্তৃপক্ষ ছাত্র নির্বাচনের সময় ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেন। মেধাবী ছাত্র অথবা অর্থ দৈন্য জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারছে না, তাদেরই বেছে বেছে এঁরা গ্রহণ করেন। অবশ্য ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেই ভারতীয় ছাত্রদের আনা হয়। মেয়েরা অনুপাতে শতকরা পনেরো জন হবে।

দেখা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, ফোটো তোলা সব হয়ে গেল— বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে বিদায় নিলাম। এই প্রতিষ্ঠান ও পায়োনিয়ার্স প্যালেস প্রত্যেক শিক্ষাবিদের দেখা দরকার।

এবার চলেছি হাউস অব ফ্রেণ্ডশীপ-এ— যেখানে এক সন্ধ্যায় রেল ইউনিয়নের ক্লাবের বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। আজ এখানে সোভিয়েত-ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে সভা আহূত হয়েছে, সেরেব্রিক্রভ এই সভার উদ্যোক্তা। কয়েক বৎসর পূর্বে ইন্দো-সোভিয়েত সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য বোম্বাই গিয়েছিলাম। মনে পড়ে জাহাঙ্গীর পোর্ট্রেট হলে প্রদর্শনী উন্মোচন হয়। সেখানে রুশ-ভারত মৈত্রীর চিত্র ও রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণের চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়, বহু রুশ উপস্থিত হন— মারাঠী, গুজরাটী বেশি।

আজকের সভায় রুশীয় সদস্য ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে আমরা

ছিলাম। চা, টফি, বাদাম চলছে কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে। আমাদেরও বলতে হল। আমি বাঙলায় বললাম, কারপুশকিন রুশভাষায় তর্জমা করে দিলেন। এখানে একজন স্কলারের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখছেন। এ সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রদের কৌতূহল বেশি। পূর্ব-জার্মানীর এক যুবকের সঙ্গে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমির রবীন্দ্র-উৎসবে পরিচিত হই। ইনি পূর্ব-বার্লিনে যে-সব নথিপত্র পেয়েছেন, তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম, পশ্চিম বার্লিনের তথ্যাদি তাঁর হাতের নাগালের বাইরে। এ ছেলেটি পূর্ব-জার্মানী অর্থাৎ কম্যুনিস্ট দেশের লোক-- পশ্চিম বার্লিনে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। হায় রে ন্যাশনালিজম!

সভাশেষে একটা সিনেমা ঘরে গেলাম। সেখানে বিমানবিহারী astronaut-দের রেড স্কোয়ারে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অভিনন্দনের ছবি দেখানো হল। তিনজন বীরকে দেখবার জন্য, ফুল দেবার জন্য লোকে কি পাগল! ক্রুশ্চেভ সকলকে আদর করছেন, তাদের বুকে পদক দিচ্ছেন— কি সম্মান! এর পর রবীন্দ্রনাথের রুশ-পরিক্রমার ফিল্ম; এটা পূর্বে দেখি নি কোথাও; দুরন্ত হাওয়া বইছে, কবি তাঁর জোব্বা সামলিয়ে মোটর থেকে নেমে চলেছেন! আমার তো খুবই ভালো লাগলো— মনে হচ্ছিল— ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবি এই মহানগরীতে এসেছিলেন— ভারতের প্রথম দূত তিনি।

এখান থেকে বের হবার সময় কর্মীরা আমাদের কিছু বই ও দু'খানা রেকর্ড দিলেন; এর একটাতে আছে Do we want war কবিতাটি রুশভাষায় ও ইংরেজি তর্জমায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। যেতে হচ্ছে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের বাড়িতে। এটা পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ-- এখনো এখানে প্রাচ্য বিভাগ ও জার্নালিজম প্রভৃতি বিভাগ আছে। একটা খুব সাধারণ ঘরে জন ত্রিশ ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছে— কয়েকটি শিক্ষকও আছেন। এরা সবাই হিন্দীর ছাত্র। ছেলে-মেয়েরা পাশাপাশি বসেছে— ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে এদের মধ্যে খুঁতখুঁতানি নেই বললেই হয়। জানি না, এই জন্যই কি বিবাহটা সহজে হয়? আমেরিকা সম্বন্ধে পড়ছিলাম 'টীন-এজারস্' অর্থাৎ বিশ না পেরোতেই ছেলেমেয়েরা বিয়ে করছে— শতকরা হার বেশ বাড়ছে; সমাজের চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তুলেছে। সে হাওয়া সোভিয়েত দেশেও লাগছে। যাক সে যৌনসমস্যার কথা।

আমাকে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন তিনি। অধ্যক্ষ বললেন, ছাত্ররা ইংরেজি জানে; সুতরাং ইংরেজিতেই বলতে হলো। আমি বললাম, দুঃখের বিষয় এমন একটা ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে, যা বক্তা বা শ্রোতা, কারও মাতৃভাষা নয়। রুশভাষা জানি নে, শেখবার বয়স নেই, আর হিন্দীতে বলতে পারতাম, যদি sexless হিন্দী বলবার অনুমতি পেতাম। কিন্তু শ্রোতারা সবাই হিন্দী জানেন ভাল করে— তাঁরা লিঙ্গরহিত হিন্দী বরদাস্ত করতে পারবেন না; তাছাড়া দ্বিবেদী হিন্দীর নামজাদা অধ্যাপক— তিনিও তাঁর ভাষায় কর্কশ ক্রিয়া প্রয়োগ করতে দেবেন না। মিনিট চল্লিশ বললাম, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মূল কথাটি। একটি ছাত্র প্রশ্ন করল, 'সোনার তরী' কবিতাটির অর্থ কি? আমি আশ্চর্য হলাম, হিন্দীর ছাত্র হয়ে এ প্রশ্ন করছে! আমি বুঝিয়ে বললাম আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি মতো। সেটা তার ভাল লাগল কি না জানি না। আর

একটি মেয়ে বললে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি তার খুব ভাল লেগেছে। আমি শুধালাম, 'কোথা থেকে শিখলে?' সে বললে, 'বিশ্বজিতের কাছে শুনি, তারপর রেকর্ড থেকে অভ্যাস করে নিয়েছি।'

দ্বিবেদীকে হিন্দী সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অনেক প্রশ্ন করল। দেখলাম, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষাটা শিখছে। দ্বিবেদী তাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন।

সভাশেষে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছি, ইংরেজি জানে বলে অসুবিধা হচ্ছে না। সেই মেয়েটিকে ডেকে বললাম, 'you ক্ষণিকের অতিথি, come to me!' সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'I am not ক্ষণিকের অতিথি ; you are ক্ষণিকের অতিথি।' তার উত্তর শুনে সকলেই খুশি ; কিন্তু চলে আসছি বলে অনেকেই দুঃখিত।

মোট কথা, জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাটিয়েছি বলে, যেখানেই তাদের দেখি, মনে হয় তাদের সবারই এক জাত। এখনও যে তাদের বিষদাঁত গজায় নি। কিন্তু একদিন দেখা যাবে তাদের অন্য রূপ। কোথায় যাবে সেই জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণা, প্রেমের জন্য পাগলামি! বড় বড় ঝুনো বুরোক্রাটদের দিকে তাকাই আর ভাবি— এঁদেরও তো যৌবন ছিল, আদর্শবাদ ছিল— দেশ ও দশের জন্য কাজ করবো বলে মনে মনে সংকল্পও ছিল! কিন্তু সে সব গেল কোথায়? আজ এ কী চেহারা!

এখনই যেতে হবে বিশ্বজিতের বাসায়। বিকালবেলায় জয়শ্রী এসেছিল ফ্রেণ্ডশীপ হাউসে নিমন্ত্রণ করতে। আমি বলেছিলাম, আমাদের গার্জেনদের ব্যবস্থা ছাড়া কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। জয়শ্রী নাছোড়বান্দা— ঠিক ব্যবস্থা করে চলে গিয়েছে।

আমাদের সঙ্গে বোরিস, লিডিয়া, দানিয়েল-চুক চললেন। বিশ্বজিতেরা থাকে পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। শুভময় একটু পরে এল সুপ্রিয়াকে নিয়ে। কিছু খেতে হল— সময় খুব কম, অ্যাকাডেমির গাড়ি দাঁড়িয়ে; আমাদের গাইডরা পৌঁছে দিয়ে ছুটি পাবে— ঘড়ি-ধরা কাজ, সময়মত চলাফেরা। লিফটে উঠে আসি— অবশ্য এসব লিফট স্বয়ংচল। নামবার সময় এ লিফট ছ'তলা থেকে সরসরিয়ে নেমে যায়— ঘণ্টা বাজালে থামে না পাঁচতলায়। তাই শুভময় ও বিশ্বজিৎ ছুটে ছয়তলায় চলে গিয়ে ছুটো লিফটে ছু'জন ঢুকে নামিয়ে আনল পাঁচতলার মুখে। তাতে উঠে আমরা নেমে এলাম।

হোটেলে ফিরে এলাম। বোরিসের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে; সে জানত না যে, চীনারা ভারত আক্রমণ করেছে। আমি বলাতে সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল; কেবলমাত্র বললে, madness। এদের সঙ্গে আমরা রাজনীতি চর্চা করি নি; স্থানীয় রাজনীতিও জানতে চাই নি।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল, লিডিয়া নীচের তলা থেকে ডাকছে, ডিনার তৈরি।

খাবার ঘরে যথারীতি নৃত্য চলছে, মঞ্চে বসে বাজনদাররা বাজিয়ে যাচ্ছে। আজ হোটেলে অনেকগুলি কিউবান অতিথি। আমাদের মত বর্ণশীলই বেশি— শ্বেতাঙ্গ বড় চোখে পড়ে না, খাস আফ্রিকান বর্ণ অনেকেরই। কিন্তু সবাই স্পেনীশভাষী ও সাহেব। খানাপিনায়, বিশেষত পিনায় কোন কার্পণ্য ও অনিচ্ছা নেই। কিউবায় মার্কিনরা হামলা করবে বলে হুমকি করেছে, তাই মস্কোর কাগজ সব খুব গরম। ক্রুশ্চেভের দীর্ঘ ভাষণ বের হয়েছে। রুশ অতিথিদের অনুরোধে কিউবানরা আজ নাচগান করল। শুনলাম এরা jazz নাচছে।

আমার পিছনে আধাবয়সী এক মহিলা বোরিসকে আমার পরিচয়

জিজ্ঞাসা করলেন ; তিনি রুশীয় ইহুদী— আমার আকৃতি দেখে তিনি বোধ হয় ভেবে নিয়েছিলেন, আমি বুঝি তাঁদের স্বজাতি ও স্বধর্মী। বোরিস আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। উঠে আসছি ; একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী লোক বোরিসকে জিজ্ঞাসা করলেন— আমি যদি তাঁর সঙ্গে বসে একটু পান করি, তবে তিনি খুব খুশি হবেন। বোরিস তাঁকে বললেন— এঁরা ভারতীয়, মদ খান না। কথাটা আংশিক সত্য, কারণ দ্বিবেদী ও আমার মত বেরসিক কমই। কারণ লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ হয়। থাক সে আলোচনা। মদ খাওয়াটা যে ভাল নয়, এটা এখন নীতি উপদেশের মধ্যে ফেলা হচ্ছে, অর্থাৎ এখন এ সম্বন্ধে ইতর-ভদ্র প্রায় একমত— দোষ কি খেলে ? ওসব ব্রাহ্ম নীতিবাগীশদের খুঁতখুঁতানি। কিন্তু মুশকিল যে লোকে তো মদ খায় না, মদ যে তাকে খেয়ে বসে শেষকালে। দেখেছি যুবক ছাত্র সুকুমার সরকারকে— এই আধুনিকতার নামে মত্তপ হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, সে দৃশ্য ভুলতে পারি নে। শেষে একদিন এল আমাদের বাড়িতে, স্ত্রীকে বললে— 'মা, মরতে এলাম।' নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। কলকাতায় ফিরে গিয়ে অকালে মরল— বরিশাল থেকে মা এসেছেন ; মরার সময় মাকে বলে, 'মা, ভাইদের কলকাতায় পাঠিয়ো না।' সে জানত, কলকাতার আধুনিকতার নেশায় সর্বনাশের পথে সে গিয়েছিল। সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি উপহসিত হয়। মনের মধ্যে অনেক কথা উঠল— এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

লিডিয়া উপর পর্যন্ত উঠে এল, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবার যেমন অনুভব করছি, এমনটা কোনবার হয় নি।' বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল : আমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম। আজ মস্কোতে আমাদের শেষ রজনী।

২১

মস্কো

২৪ অক্টোবর ১৯৬২

আজ সোভিয়েত-রুশে বাসের শেষদিন। সকালে উঠেই এই কথাটি মনে হল— জীবনে অঘটন ঘটল। আর কখনও এ দেশে আসা কি হবে? বয়স যে অনেক হল। সকালে আজ ভারতীয় দূতাবাসে সকলে চললাম; শ্রীজয়পাল এখন চার্জে আছেন। সুবিমল দত্তের পর আসার কথা মিঃ কাউল-এর; অন্তর্বর্তী পর্বে জয়পালের উপর ভার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মালবীয় ও এস. কে. দে এসেছেন সোভিয়েতের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। তাই তাঁদের ব্যবস্থা সরকার থেকে হোটেলেই করা হয়েছে। তা না হলে দূতাবাসেই উঠতেন।

জয়পালের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে— ভারতীয় ভাজিভুজি চা-এর সঙ্গে এল; জয়পালের লোকটি দেশ থেকে আনা, তাই পকোড়ি প্রভৃতি খেতে পান। চীনাদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যে খবর পেলাম, তা খুবই খারাপ। বোঝা গেল, এটা সীমান্ত হাঙ্গামা নয়— বহু দিনের সুচিন্তিত প্ল্যান মাফিক আক্রমণ, অথচ যুদ্ধ ঘোষণা না করেই যুদ্ধ— এবং ভারতীয়রা হটেছে ও বন্দী হয়েছে!

এখান থেকে মার্কেটে চললাম— কৃপালানী লেখকগোষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন— হোটেলে খাবেন না। আমাদের হাতে যে কয়টা রুবল আছে, ফুঁকে দিতে হবে আজ।

হোটেলে ফিরলাম, কিন্তু আজ মোটা কিছু খেলাম না— টুকিটাকি চলল— ক্ষিধে নেই। বের হতে হল দুটোর মধ্যে— উপস্থিত হতে হবে— ফোনে ফোনে কথা ঠিক হয়ে গেছে যে

তিনটার সময় আমাদের তিন জনকে মস্কো রেডিও স্টেশনে হিন্দীতে দশমিনিট করে কিছু বলতে হবে। রেডিও স্টেশনের বাড়িটা আমাদের কলকাতায় গার্স্টিন প্লেসের পুরানো রেডিও বাড়ির মত। শুনলাম, নূতন বাড়ি তৈরি হচ্ছে বিরাট করে; সেখানে উঠে যাবে।

আমাদের বক্তব্য প্রথমে শুনে নিল মধু নামে একটি হিন্দীভাষী যুবক— মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বেশ ভাল লাগল। রেকর্ডে কণ্ঠস্বর প্রভৃতির রিহার্সাল হল। তারপর আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হল, শোনান হল। আমার পর দ্বিবেদী এবং তারপর কৃপালানী। আমি হেসে বলেছিলাম, বাঙালীর অ-লিঙ্গী হিন্দী, সিন্ধীর সিন্ধীগন্ধী হিন্দী আর বালিয়াবাসীর খাঁটি হিন্দী সকলে শুনবে। বক্তৃতার জন্য সতের রুবল করে বোধ হয় পেলাম। রুবলগুলো আজই খরচ করতে হবে, চল মার্কেটে। কিন্তু তার আগে যেতে হবে অ্যাকাডেমিতে— তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। প্রাচ্যবিদ্যার কর্ণধার চেলিশভ ফিরেছেন বিশ্রাম মন্দির থেকে। দেশের নানা স্থানে Sanatoria আছে— সেখানে সোভিয়েত-কর্মীরা বিশ্রামের জন্য যেতে পারেন ছুটি পেলে। চেলিশভ খুব ভাল হিন্দী, উর্দু জানেন— কথাও বলতে পারেন অনর্গল। আমরা কয়জন এবং আকরোমেভিচ, সেরিব্রেকভ এবং আর দু'চারজন ছাড়া আর কেউ ছিল না পার্টিতে। নানা কথার মধ্যে চেলিশভ বললেন, তিনি হয়তো ভারতে যেতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে। তবে তখনই বললেন, স্বামীজির রাজনৈতিক মতামত ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমি দেশে ফিরে স্থানীয় লোকদের বলেছিলাম— স্বামীজিকে নিয়ে তোমরা ভজন-পূজন, যাগযজ্ঞ হোম, চণ্ডীপাঠ— যা খুশি কর— কিন্তু তাঁকে মানুষ

রূপে দেশের কাছে ধরবার ব্যবস্থাও রেখো, তাঁর বীরের মূর্তি দেখতে দিও।

এখান থেকে বের হয়েই চললাম মার্কেটে— পকেটে রুবল-নোটগুলো খড় খড় করছে— তাদের খরচ করতেই হবে। বাজার ঘুরতে টুকিটাকি কেনা তো হয়েছে, একটা ক্যামেরাও কিনে ফেললাম, ইতিপূর্বে কৃপালানী, দ্বিবেদী কিনেছেন। জীবনে ক্যামেরায় কখনও টিক করি নি। ভাবলাম দেশে গিয়ে ছেলে-বৌদের কাউকে দেওয়া যাবে।

জিনিসপত্র নিয়ে বোরিস চলে গেলেন হোটেলে— আমরা লিডিয়ার সঙ্গে চললাম বলশোই থিয়েটারে। মার্কেট থেকে কাছেই— তাই হেঁটে যাওয়া গেল। বলশোই থিয়েটারে আজও টিকিট কাটা হওয়াতে আমি বললাম,— 'আর্ট থিয়েটার দেখলে হত না?' শুনলাম— আর্ট থিয়েটার এখন তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে। স্ট্যানিসলাভস্কির মৃত্যুর পর (১৯৩৮) তাঁর সহকর্মী নেমিরোভিচ দানচেন্‌কো তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪৩) আর্ট থিয়েটারের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছিলেন। লণ্ডন, প্যারিস, টোকিওতে আর্ট থিয়েটার সুনাম অর্জন করে।

আজ বলশোইতে কেবল ব্যালে— নাটক অভিনয় নয়। তবে কাহিনীকে নৃত্যে রূপ দিয়েছে। প্রথমেই Chopin-এর বাজনা ; এই স্বল্পায়ু পোলিশ সঙ্গীত-শিল্পী অমর হয়ে আছেন কয়েকটি Polonaise Fianaisil ও গোটা কয়েক mazurka-র জন্য। প্রথমগুলো পোল অভিজাতদের নৃত্য থেকে, দ্বিতীয় পোল চাষীদের গ্রাম্য নৃত্য থেকে গৃহীত। কিন্তু শিল্পীর হাতে পড়ে তাদের নূতন রূপ হয়েছে। আজকের রাতে mazurka দুটো হল। স্কচ-কোবার নৃত্য অনবদ্য— লোকের কি উৎসাহ।

প্রথম বিরামের পর C. Ryno-র ব্যালে; তিনি গ্যেতের ফাউস্ট থেকে একটা অংশ সংগীতে নৃত্যে রূপ দিয়েছেন। শেষটি যাকে বলে জিমনাষ্টিক ডান্স অর্থাৎ দেহের কসরতের সঙ্গে ছন্দ রেখে নৃত্য। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে এক ফরাসী যুবক এই দেহছন্দের নৃত্য দেখিয়েছিল— সর্বাঙ্গের পেশী যেন ছন্দোবদ্ধ হয়ে নৃত্যে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাতে ভঙ্গি ছিল বেশি; আজকে যা দেখলাম, তাতে গতিটাই বেশি। মোট কথা— মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম। পাশ্চাত্য নৃত্য ও বাক্যের টেকনিক বুঝিনে বলে নিজেকে অশিক্ষিত মনে হল। বাল্যকাল থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়তে এবং চিত্রকলা দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত হই। তখন কানে শুনে শুনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতটার রস-গ্রহণ শক্তি অর্জন করব না কেন?

যাক তত্ত্বকথা। রাত দশটা বেজে গেছে। চল হোটেলে। বোরিস এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে সাহায্যও করলেন। হোটেলে আজ অনেকেই খাচ্ছি, আমরা ছাড়া সেরিব্রেকোভ, চেলিশভ, বলরাজ সাহানীর ভাই। দেখা করতে এসেছেন অনেকে— বালপুরী সস্ত্রীক, শুভময়, বিশ্বজিৎ।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। সাড়ে এগারোটার পর আমরা হোটেল ছাড়লাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম— হোটেল-পোর্টার বা অন্যদের কিছু দেব নাকি। বোরিস জানালেন সে রীতি এ দেশে নেই। সকলেই আমাদের সঙ্গে এয়ার-পোর্টে চললেন; মাঝরাত্রি তখন; বহুলোক অপেক্ষা করছে। বোরিস আর আমি একটা লাউঞ্জে বসে, অন্যেরা কাফেতে গিয়েছেন। মাঝে একবার কোথায় যাবার জন্য কি একটা ঘোষণা করে উঠল। বোরিস খোঁজ নিতে গেল। না, সে প্লেন আমাদের না— অন্য দিকে যাচ্ছে।

প্লেন ছাড়ল রাত ছুটোয়, এ প্লেন যাবে জাকার্তা (জাভা) পর্যন্ত,

অনেকগুলি ইন্দোনেশিয়ান এখান থেকে উঠল। অধিকাংশই নিতান্ত বালক ; জানি না কি শিখতে এসেছিল।

একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, তবুও সকলে প্লেনের সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। লিডিয়ার চোখ ছলছল করছে। বুঝলাম এ-কয়দিনের সান্নিধ্যে তার মায়া পড়েছে।

প্লেন ছাড়ল— উড়ল। অন্ধকারের মধ্যে মস্কোয় নেমেছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে উড়লাম।

রাত তিনটায় চা এনে দিল। এ যে সেই এয়ার হোস্টেস, যাকে সেবার দেখেছিলাম আসবার সময়। সেও বোধ হয় চিনেছিল ; স্মিত হাসল।

আমাদের তিনজনের আসন এবার কাছাকাছি ছিল। একটু ঘুম এল ; ঘুম ভাঙলে দেখলাম, আকাশে আলো হয়েছে। তার পর বেলা সাতটায় তাসকন্দ বিমানবন্দরে এসে প্লেন থামল।

পাসপোর্ট দেখানোর পর্ব শেষ করে নামলাম। শুল্কঘরে শুধাল রুবল আছে কি না— অর্থাৎ দরকার থাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাও ভারতীয় টাকায়। বললাম— যা পেয়েছিলাম সব খরচ করে এসেছি। কয়েকটা কোপেক নিয়ে যাচ্ছি, নাতি-নাতনীদের দেবার জন্য।

তাসকন্দ এয়ারপোর্টের রেস্তরাঁতে ব্রেকফাস্ট খেলাম। ভূরি-ভোজের আয়োজন— কে খাবে অত ? তাসকন্দের বিখ্যাত তরমুজ — সবাই খাচ্ছে, আমিও খেলাম। বন্ধুরা খেলেন না, বললেন— এই ঠাণ্ডায় তরমুজ খায় ? কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাদের অত শীতে রোজ রাতে ডিনারের পর আইসক্রীম খেতাম— আমারই শখ বেশি।

আলাপ হল সুদ নামে এক পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে, সুইডেনে

চার বছর ছিল— ইঞ্জিনীয়র, ধাতুবিদ্যাপারদর্শী। কথায় কথায় সে বললে, দেশে ফিরছি থাকব বলেই। অনেক সময়ে আমাদের মত যুবকদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, আমরা টাকার জন্য বিদেশে পড়ে থাকি ; আসলে কাজের সুবিধা পাই বলে থাকি। দেশে যদি কাজ করবার সুযোগ পাই, তবে থেকে যাব। সুদর্শন যুবক আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলি বললে।

আরেকজন শ্বেতকায়— বললেন, তিনি মালয়ান। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনাকে দেখে তো মনে হয় না, আপনি মালয়বাসী। ভদ্রলোক বললেন— এখন মালয়ে চীনা ইংরেজ ভারতীয় সকলেই মালয়ান। ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরে থাকেন, ব্যবসা আছে। বললেন, সিঙ্গাপুর নিয়ে মালয় ফেডারেশন শীঘ্র হবে। বোর্নিও-র সারাবককে ফেডারেশনের মধ্যে টানবার কথাও চলছে ; তা হলে একটা বিরাট ফেডারেশন তৈরি হয়ে উঠবে। বোঝা গেল— এটা ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট হবে। পাশেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের রঙ অস্পষ্ট। তাই ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে মালয় ফেডারেশনটা গড়ে দিতে পারলে হয়তো আখেরে একদিন কাজে লাগতে পারে। ইংরেজের দৃষ্টি শকুনিকেও হার মানায়।

তাসকন্দ থেকে প্লেন ছাড়ল পৌনে নটা— মস্কো টাইম।

আবার সেই তুষার-তরঙ্গ এল— কারাকোরাম, হিমালয়ের উপর দিয়ে চলেছি— চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি নগাধিরাজের শোভা, আর তো দেখা হবে না এ চোখ দিয়ে এই শোভা।

দিল্লীর পালাম এয়ারপোর্টে প্লেন নামল বারটা তিরিশ মিনিট অর্থাৎ ভারতীয় ঘড়ির দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটে। কৃপালানীকে স্বাগত করবার জন্য এসেছেন নন্দিতা ও তাঁর বান্ধবী রেখা ও অন্যেরা।

দ্বিবেদীকে নিতে এসেছেন বাড়িশুদ্ধ প্রায় সকলেই। সকলেই আমার চেনা— পনেরো দিন আগে দেখা হয়েছিল। আমাকে নিতে এসেছে আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বপ্রিয়। তাকে দেখে খুবই ভাল লাগল। কাস্টমস্‌এ বেশি দেরি হল না ; বললাম যা এনেছি, ক্যামেরা আছে — দাম তের রুবল। অফিসারটি একবার তাঁর বড়কর্তার কাছে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে, আপনারা যান।

বিশ্বপ্রিয় ট্যাক্সিতে এসেছিল, সেই গাড়িতে করেই দিল্লীতে আমার ভাইঝির বাড়ি সুন্দরনগর পৌঁছলাম।

সোভিয়েত সফর শেষ হলো— পক্ষকালের এই অভিজ্ঞতা জীবনের সত্তর বৎসরের পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ-জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।...পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত— এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।...'